KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 5/6 5/7-8 5/9 5/10 5/11 5/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রীস ও রোম। *

কোন একটি জাতির ইতিহাস থাকা না থাকা কেবলমাত্র তার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না ; সেই সঙ্গে তার জাতীয় জীবন কর্ম্মক্ষম এবং সৃষ্টিক্ষম হওয়া চাই।

সেই জাতিকেই ঐতিহাসিক জাতি বলা যায়, যার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের নিয়মসকল আবিষ্কৃত হয়েছে, যে শাসনতন্ত্রে কিছু-না-কিছু শৃঙ্খলা স্থাপন কর্‌তে পেরেছে, এবং যার সামাজিক ব্যবস্থা কতক পরিমাণে ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সে জাতির একটি ধর্ম্মজ্ঞান, একটি নীতিজ্ঞান আছে ; এবং সে জাতি হাতের কাজে ও মনের কাজে দক্ষতার পরিচয় দেয়। ঐতিহাসিক জাতি শিল্প, কলা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি করে। সে জাতি নিজের শক্তি প্রয়োগ কর্‌বার জন্য, ধনবৃদ্ধি এবং অহঙ্কার চরিতার্থ কর্‌বার জন্য অপর জাতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে ; সে হয় ব্যবসাবাণিজ্য করে, নয় দেশ জয় করে, কিম্বা একসঙ্গে দুই-ই করে।

আজকের দিনে অনেক জাতিই ঐতিহাসিক নামের যোগ্য ; তাদের প্রত্যেকের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং পরস্পরের যোগাযোগের নামই ইতিহাস। কিন্তু আধুনিক কাল থেকে যত দূরে পিছিয়ে যাওয়া যায়,

* প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Lavisse-এর "Vue Générale de L'Histoire Politique de L'Europe" নামক গ্রন্থ হতে অনূদিত।

ততই এইপ্রকার জাতি বিরল হয়ে আসে। য়ুরোপে প্রথমে এইরূপ জাতি একটিমাত্র ছিল—সে হচ্ছে গ্রীক জাতি; এবং গ্রীকদের পরে আর একটি জাতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ অধিকার ও বিস্তার করেছে—সে হচ্ছে রোমান জাতি।

গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস নিয়ে সভ্যতার যে আদিপর্ব্ব রচিত হয়, তার শেষ হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে; সেই সময়ে জর্ম্মান ও শ্লাভজাতিরূপ নূতন অভিনেতা আবির্ভূত হয়ে, যে ইতিহাস এতদিন সহজ সরল ছিল, তাকে জটিল করে তোলে।

গ্রীস।

য়ুরোপের ইতিহাস যে তার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হতে, বা আদিম সভ্যতার ক্রোড়দেশের কাছ হতে আরম্ভ হ'ল, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে সকল জাতি য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর তীরদেশে, লিবাননের উপকূলে এবং নীল নদীর ধারে বাস কর্‌ত, গ্রীস তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুফল লাভ কর্‌লে বটে, কিন্তু এই সকল পূর্ব্ব সভ্যতার সঙ্গে তুলনায় গ্রীক সভ্যতার একটি বিশেষত্ব ছিল, যেটিকে য়ুরোপীয় গুণ বলা যেতে পারে—সে হচ্ছে জীবনীশক্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি।

গ্রীস যে প্রথম থেকেই য়ুরোপীয় সভ্যতার ছাঁচ গড়ে তুল্‌লে, সেটাও কিছু বিচিত্র নয়। যে দেশ তার উপকূলের ভাঁজে ভাঁজে বাঁকে বাঁকে সমুদ্রের জলকে টেনে নিয়ে আসে, এবং যার উচ্চ তীরভূমি সমুদ্রের জলের মধ্যে আপন শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে দেয়; যে উপদ্বীপ দ্বীপে বেষ্টিত, এবং অধিত্যকা-ঘেরা উপত্যকায় বিভক্ত, সে যেন আমাদের য়ুরোপ-নামক মহা-উপদ্বীপের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—সেই প্রকার

বিস্তীর্ণ তার তীর, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন তার সীমারেখা। গ্রীস যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত একখানি সংহত য়ুরোপ।

তার ইতিহাস য়ুরোপের ইতিহাসের সূচনা। গ্রীসের খণ্ড-জাতি-সকল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়, অথচ পৃথক। তার নগরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রবিশেষ, এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধে রাজনীতির সকলপ্রকার তন্ত্রই ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি তিনটি নগর সময়ে সময়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবে। গ্রীস তার সহরের পুণ্য গণ্ডির মধ্যে একটি রাষ্ট্রতন্ত্র এবং একটি সমাজতন্ত্র গড়ে তুল্‌তে পেরেছিল। মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল—কাব্যে ও কলায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, শিল্পকর্ম্মে ও বাণিজ্যব্যবসায়। এই বিচিত্র কর্ম্মলব্ধ শক্তি সে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের চারিপাশের উপকূলে সে নিজ নগরীর কন্যাস্বরূপ অন্যান্য নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু সে নিজেকে যেমন কখনও এক রাষ্ট্রে আবদ্ধ করেনি, তেমনি এই বাহিরের প্রদেশগুলিকে একত্র করে' কখনও সাম্রাজ্যও গড়ে' তোলে নি। যখন তার কর্ম্মক্ষমতা নিঃশেষ হ'ল, ও যখন সে ম্যাসেডোনিয়ান নামক একটি সামরিক জাতির অধীন হয়ে পড়্‌ল, তখন কয়েকটি নব্য গ্রীকরাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান গুলি আসিয়া বা মিশরদেশে।

উত্তরকালে অন্ততঃ য়ুরোপে গ্রীসের পরমায়ু দীর্ঘ হবে, কারণ সে ভূ-ভাগে গ্রীক সভ্যতা নানা আকারে তার প্রবল প্রভাব বিস্তার কর্‌বে। প্রজা-তন্ত্র রোমের আচার ও বিচার তার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হবে। ইস্তাম্বুল পত্তনের পর তার দ্বারা 'বাইজান্টিনিজম্' নামক একটি

ধর্ম্মমূলক এবং রাজনৈতিক সভ্যতার সৃষ্টি হবে। রোম-সভ্যতার অন্তিম দশায় তার দ্বারা রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য নষ্ট হবে। মধ্যযুগে গ্রীক সভ্যতা পশ্চিম ইউরোপের মতিগতি এবং অনুষ্ঠানের প্রতিবাদী হবে, ও খৃষ্টধর্ম্মের শাসন-তন্ত্রের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ করবে। তার-পরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে সে ইতালীয় "নবজীবনের" যুগে মানুষের মনকে নতুন করে গড়বে, এবং বর্ত্তমান যুগের মানসী সভ্যতা সৃষ্টি করবে।

রোম-রাজত্ব।

গ্রীসীয় অন্তরীপের সঙ্গে ইতালীয় অন্তরীপের সাদৃশ্য নেই; তার রেখাগুলি অত ঢেউ-খেলানো নয়; তার চারপাশে অত দ্বীপের ভিড় নেই; গ্রীসের মত তার দ্বারসকল পূর্ব্বমুখী নয়। অপর পক্ষে ইতালী ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত, এবং সিসিলি তাকে প্রায় আফ্রিকার দৃষ্টিপথ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। গ্রীসের তুলনায় ইতালী ঢের বেশি মহাদেশের মত—নাবিকেরা যাকে বলে "স্থলকায়"। বিদেশী নাবিক এ দেশের সমুদ্রতীরবাসীদের দেখা দিত বটে, কিন্তু যে নগরের বিধিবিধানে তারা ঐক্যবদ্ধ, সে নগরের অধিবাসীগণ ছিল শ্রমজীবী।

চাষী যেমন করে' তার চাষের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে ক্রমে সুডোল করে' আনে, তেমনি রোমের প্রথম কয় শতাব্দী তার রাজ্য-বিস্তারেই কেটে গেল। বিজেতামাত্রই যেমন করে থাকে, সে দেশ জয় করতে আরম্ভ করেছিল বলেই ক্রমান্বয় জয় করে' যেতে লাগ্‌ল। প্রথম কয়টি যুদ্ধ অপরাপর যুদ্ধ টেনে নিয়ে এল; প্রথম ক'বার জয়-

লাভের দরুণই অপরাপর জয়লাভ তার পক্ষে যুগপৎ আবশ্যক এবং সহজ হয়ে পড়্‌ল। শেষে তার এই বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল যে, অপর জাতিকে পদানত করাই তার জাতিধর্ম্ম; দেশজয়ই তার একরকম ব্যবসা হয়ে পড়্‌ল।

"Thine, O Roman, remember, to reign over every race."

ইতিহাসের ক্ষেত্রকে রোম অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে, তার মধ্যে স্পেন, গল, ব্রিটানি, আল্পস্ পর্ব্বত ও ডানুব নদীর মধ্যস্থিত দেশ, এবং জর্ম্মানির একাংশকে ভুক্ত করে' নিলে। অধীন দেশের ধনরত্ন আহরণকল্পে, বিজিত দেশকে রোমের "প্রদেশে" পরিণত করবার প্রথা উদ্ভাবিত হল। তার শাসনফলে পুরাতন জাতিগুলির বিশেষত্ব লুপ্ত হ'ল, এবং এক "রোম-মণ্ডল"-এর পরিধির মধ্যে প্রাচীন ঐতি-হাসিক বা স্বাভাবিক সীমান্তরেখাগুলি পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। 'রোম-মণ্ডল' অর্থে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ সুন্দর দেশ, যার কেন্দ্রে মাথা তুলেছিল "ক্যাপিটলের অটল পাষাণ"। গ্রীসীয় নগরগুলি প্রত্যেকে নিজ সাধ্যমত উপনিবেশের পত্তন করেছিল; গ্রীস নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে' দিয়েছিল; রোম পৃথিবীকে কেন্দ্রীভূত করে' এনেছিল। গ্রীক জাতি নামে এক জাতি ছিল বটে, কিন্তু গ্রীক-সাম্রাজ্য বলে' কিছু ছিল না; অপর পক্ষে রোমান জাতি ও রোম-সাম্রাজ্য, এ দুই জিনিষই ছিল।

রোমের কার্য্যে গভীরতা এবং একাগ্রতা ছিল; সে অপরাপর জাতিকে গড়েছে, অরাজকতার স্থানে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে, বিজিত জাতিকে নিজের ভাষা, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়েছে। বিশ্ব-মানব একজাতীয়তা বা "মানবজাতি"রূপ উদার কল্পনা তার মনে

স্থান পেয়েছিল। তার বিধি-বিধানে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এমন অসাধারণ ক্ষমতা দেখে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না,—কিন্তু এর সব ফলই ভাল হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

সবাইকে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ মানুষের যথার্থ অভিব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য আবশ্যক। যত বেশি লোক রেষারেষি করে' কাজ করে, ততই পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র উর্ব্বর হয়ে ওঠে। রোম সাধ্যমত প্রতি জাতির বিশেষত্ব নষ্ট করেছে, তাদের যেন জাতীয় জীবনযাত্রার পক্ষে অক্ষম করে' ফেলেছে। যখন এই সাম্রাজ্যের সমবেত সাধারণ জীবন ফুরিয়ে এল, তখন ইতালী গল ও স্পেন, এরা নিজেদের জাতিরূপে গড়ে তুল্‌তে অসমর্থ হল; বর্ব্বরদের আগমনের পরে, এবং অনেক শতাব্দী ধরে' বহু বিপদ আপদ মারামারি কাটাকাটির মক্স করবার পর তবে তাদের দ্বারা একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক সভ্যতার গঠন আরম্ভ হল।

যে সব দেশকে রোম সভ্য করেছে, তাদের কাছে সে নিছক্ কৃতজ্ঞতার দাবী করতে পারে না। আমরা স্বাধীন গলের সঙ্গে রোমক গলের তুলনা করতে ভালবাসি। গ্রামসমূহ নগরে পরিণত, কুঁড়ে ঘর প্রাসাদে রূপান্তরিত, মেঠো পথের বদলে পাথর-বসানো রাস্তা, অশিক্ষিত বক্তার স্থানে কথাকুশল বাগ্মী, অসভ্য যোদ্ধার পরিবর্ত্তে সেনাপতি বা সম্রাট দেখ্‌তে পাই। আমরা এই ভেল্কি-খেলায় বিস্মিত হই, এবং এই গল-রোমক নগরগুলির সুখের জীবনের তারিফ করি।

কিন্তু যে সকল দেশকে রোম জয় করে' বহুকাল যাবৎ ভোগদখল করে নি, সে সকল দেশ যে আজ পৃথিবীতে এমন উচ্চ স্থান

অধিকার করেছে, এমন প্রবল বিশেষত্ব রক্ষা করেছে, ভবিষ্যতের প্রতি এমন অটল আস্থা রেখেছে—এ কেমন করে' হল? অতীতে বেশি আয়ুক্ষয় করেনি বলেই কি তাদের দীর্ঘজীবনে অধিকার বেশি? কিম্বা রোম এমন সব চিন্তার ধারাবাহিক অভ্যাস, এমন সব মানসিক ও নৈতিক ছাঁচ রেখে গেছে যা' স্বাধীন চেষ্টার হন্তারক ও প্রতিবন্ধক?—এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই; যে-সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বিশেষ আবশ্যক, সেইগুলিরই মীমাংসা কোনও কালে হয় না। যাই হোক, এই সব ভেবেচিন্তে আমরা যেন সরাসরি বিচার করতে কুণ্ঠিত হই; সীজার যে Vercingetorix-কে জয় করেছিলেন, সেটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয় কিনা, তা নিশ্চিত বলা যায় না।

দুই সাম্রাজ্য।

যতই সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হোক্ না কেন, এই বিপুল বিজয়ীশক্তির বিরুদ্ধে এমন অনেক বিরোধী শক্তি মাথা তুলেছিল, যাদের সে পরাভূত করতে পারে নি।

অধিকাংশ স্থলে উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যেই মনোভাবের অমিল সুতরাং স্থায়ী বিরোধ ঘটে থাকে। কিন্তু রোম-রাজত্বকালে উত্তর-প্রদেশ ছিল বাহিরের শত্রুমাত্র, এবং তাকে বাইরেই রাখা হয়েছিল। তখন প্রকৃত বিরোধ ছিল য়ুরোপের পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে—যে পশ্চিম প্রদেশকে সভ্যকরতঃ রোম অধীন ও আত্মসাৎ করেছিল, এবং যে পূর্ব্বপ্রদেশ তখনও তার গ্রীসীয় সভ্যতা রক্ষা করেছিল।

পশ্চিম য়ুরোপে রোম তার ভাব ও ভাষার প্রভাব বিস্তার করেছিল; কিন্তু গ্রীসীয় সভ্যতার কাছ থেকে সে বড় জোর দক্ষিণ ইতালী

এবং সিসিলিকে ভাঙ্গিয়ে নিতে পেরেছিল ; এড্রিয়াটিক সমুদ্র হতে Taurus পর্য্যন্ত, গ্রীসের ভাষা এবং সভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানে গ্রীক নামের পরিবর্ত্তে রোমক নাম বসেছিল বটে, কিন্তু শুধু বাহিরের চেহারাটাই রোমান ছিল। যেদিন কন্‌স্টাণ্টাইন দ্বিতীয় রোমের প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন, সেদিন যে সাম্রাজ্যের পত্তন হল, বাইজাণ্টাইন রাজদপ্তরে তার নাম রোমক-সাম্রাজ্য হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দপ্তরে সেটী চিরদিনই গ্রীক-সাম্রাজ্য।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ছিল; সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে, যেদিন থিয়োডোসের দুই পুত্র—একজন রাভেন্নাতে, আর একজন ইস্তাম্বুলে রাজপাট বসালেন। তখন থেকে যে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সূত্রপাত হল, তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব কাজ এবং স্ব স্ব শত্রু ছিল ; সে শত্রু বহুসংখ্যক ও প্রবল, এবং সেই দুরন্ত জনসমূহই এবার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ অধিকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে।

অধঃপতনের কারণ।

দুই সাম্রাজ্যে বিভক্ত হওয়াই রোমরাজত্বের বিনাশের কারণ নয় ; কেবলমাত্র বাহিরের শত্রুর প্রভাবেও তার পতন হয় নি। রোমের পতন তার আচার অনুষ্ঠানের অবনতি, তার যুদ্ধজয় ও লোকদমনের কর্ম্মফল। তার এই বিপুল প্রজামণ্ডলীকে একটি রাজা দেবার প্রয়োজনবশতঃ প্রজাতন্ত্র রোম অবশেষে রাজতন্ত্র হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু বস্তুতঃ রাজশাসনের যুগ আরম্ভ হবার পরেও রোমে প্রজাতন্ত্রের বাহ্যানুষ্ঠানেরই ঠাট্ বজায় ছিল। রোমের রাজতন্ত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী বই কিছু ছিল না ;

স্থায়িত্বের পক্ষে প্রথমত যা থাকা দরকার, সেই উত্তরাধিকারীত্বের নিয়মই তার ছিল না। প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর পরেই গোলযোগ উপস্থিত হত ; যিনি পৃথিবীর ঈশ্বর তাঁর নির্ব্বাচন অনেক সময়ে দৈবযোগেই সম্পন্ন হত। অবশ্য ক্রমে রাজতন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত কর্‌তে হল,—কিন্তু তখন সম্রাট হলেন নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাচারী এবং একাধিপতি। তাঁর রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীকে আত্মসাৎ করা, এবং কার্য্যতঃ সে উদ্দেশ্য অতিমাত্রায়ই সুসিদ্ধ হয়েছিল। রোমসাম্রাজ্যমণ্ডল অবশেষে এতেই নিঃশেষিত হ'ল।

পতনের কারণের মধ্যে রোমের দীর্ঘায়ু এবং তার তেজারতি ব্যবসাকেও ধরা যেতে পারে। পৃথিবীর জরা উপস্থিত হয়েছিল। সে নবীনের অন্বেষণ এবং অপেক্ষা কর্‌ছিল। রাজনৈতিক বিপ্লবের দ্বারা নূতনকে পাবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সাম্রাজ্য ছাড়া আর কোনরকম শাসনপ্রণালী যে হতে পারে, তা' কারো ধারণাতেই আসে নি ; সামাজিক বিপ্লবের দ্বারাও নয়, কারণ ধীরে ধীরে সে সমাজে যে জাতিভেদ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ছাঁচেই সকলের মন ঢালাই হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম্ম-বিপ্লব একটি ঘটেছিল বটে, কিন্তু সে হচ্ছে সাম্রাজ্যের বিপক্ষে। যে প্রাচীন সমাজ আপনাতেই আপনি মুগ্ধ ছিল, যারা পরপারের কোন ধারই ধার্‌ত না, তাদের কাছে "আমার রাজ্য এ পৃথিবীর নয়" বলা মানে তাদের প্রতি ঐশী ঘৃণা প্রকাশ করা। "যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দাও, যাহা সীজারের তাহা সীজারকে দাও" বলা মানে ঈশ্বর এবং সীজারের পার্থক্য ঘোষণা করা—যদিও এযাবৎ এক সীজারেতেই ঐশী ও মানবী, দুই শক্তি মিলিত ছিল। একবার এই পার্থক্য মেনে নিলে রাজকর্ম্ম

অপেক্ষা দেবঋণ বেশি না হয়ে যায় কেমন করে' ? যদি বল "আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংশ হবে"—তাহলে সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে "অমর এ সাম্রাজ্য"—এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয় ;—"অটল পাষাণ"কে টলানো হয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

একটি প্রেমের গান।

—:*:—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

এই হচ্ছে গানটা। কিন্তু "লাখে না মিলল এক"—তাই এমন গান বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে ঐ একটির দর্শন পেলেম।

(২)

"তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই ত এ লাখ লাখ যুগেও এ প্রেমের হ্রাস নেই—এ যে তিলে তিলে প্রতি পলে পলে নতুন কর্‌ছে—নতুন হচ্ছে— মর্‌চে ধরবার অবসরই নেই এতে—স্বাদহীন হবার সম্ভাবনাই নেই এতে। যেখানে পুরাতন সেখানেই মানুষের অশ্রদ্ধা—যা পুরাতন তাই যে মানুষ অত্যন্ত করে' জানে, নিঃশেষ করে' জানে। যেখানে মানুষ নিঃশেষ করে' জানে সেখানে মানুষের আর চলবার পথ নেই—আকাঙ্ক্ষা সেখানে যোগময়—চেষ্টা সেখানে ক্লান্তিজনক অর্থহীন। সেখানে আছে শুধু আকাশের বোঝা—আনন্দের অবদান সেখানে নেই। আর আরামের বোঝা সুস্থ ও প্রাণবান মানুষের পক্ষে ঘোর অধর্ম্ম। তাই মানুষের প্রেমের লাখ লাখ যুগেও হ্রাস হবে না—লাখ লাখ যুগেও হৃদয়ে হৃদয় রেখে যে প্রেম স্বাদহীন হবে না—সে-প্রেম সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে যে, সে-প্রেম যেন তিলে তিলে নূতন করে—সে-প্রেম যেন "তিলে তিলে নূতন হোয়"। তিলে তিলে যদি তা নতুন হ'য়ে না ওঠে তবে আজ যাকে কেঁপে হিয়ায় রাখ্‌ছি কাল তাকে ডেকে বিদায় দেব। কারণ জীবনের খেলাই হচ্ছে নতুনের খেলা।

"তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবনের খেলাই হচ্ছে ওই—"তিলে তিলে নূতন হোয়"। কত লক্ষ বৎসর মানুষ বেঁচে আছে—কিন্তু তবুও সে আপনার কাছে আপনি বোঝা হ'য়ে উঠ্‌ল না—আপনার কাছে আপনি গলগ্রহের মতো হয়ে উঠ্‌ল না—কারণ সে যে "তিলে তিলে নূতন হোয়"। সে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাই তার আপনার সম্বন্ধে আপনার কৌতূহলের শেষ নেই—অজ্ঞাত যা, গুপ্ত যা, সুপ্ত যা, তা দিনে দিনে বিকশিত হ'য়ে তার চোখের সাম্‌নে মনের

সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছে; তাই তার ক্লান্তি নেই, ঔদাসীন্য নেই, বৈরাগ্য নেই। জীবনে যখন এই নতুনকে ঠেকিয়ে রাখ্‌ব তখনই জীবনের মরণকেও ডেকে আন্‌ব। কারণ মানুষের প্রতিপলের মরণই তার প্রতি দিনের জীবনকে গড়ে' তুল্‌ছে।

তিলে তিলে পলে পলে মানুষ নতুনকে পাচ্ছে বলে' এ জগতের রঙ্‌ তার চোখে আজও ফিঁকে হ'ল না। বাহিরের জগত হয়ত হাজার বছর সেই একই আছে—সেই বর্ষায় ঘন দেয়ার গুরু গুরু ডাক—কালো মেঘের জিলিক হানাহানি—পাগল বাদলের উতোল ধারা; সেই শরতের চোখ-গলানো মন-মাতানো জোৎস্না; সেই বসন্তের সবুজ বনের অবুঝ হাওয়ার মাতামাতি; সেই শীতের রহস্যময় কুজ্ঝটিকা ঘেরা যেন স্বপ্নের জগত—হয়ত সেই সবই এক—কিন্তু মানুষ পুরাতনকে ত্যাগ করে', তার উপরে বিস্মৃতির তুলি বুলিয়ে তার অন্তরের জগতে প্রতি নিমেষে নতুনের জন্যে আসন পাত্‌ছে। তার ভয় কি জানি যদি কোন কিছুকেই আবার সে নতুন করে' না পায়—কি জানি যদি পুরাতন তার গুরু গম্ভীর অতিমাত্র চেনা মুখ নিয়ে হাজির হয়। সে চেনার মধ্যে যে চাইবার কিছু নেই—খুঁজবার কিছু নেই—বুঝবার কিছু নেই—তার পিছনে যে একটা মস্ত কালো দাঁড়ি সমাপ্তির শেষ টেনে বসে' আছে। আর সমাপ্তিকে নিয়ে ত মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না—সমাপ্তি থাক্‌লে যে মানুষের সমস্ত প্রকৃতি, তার মন বুদ্ধি চিত্ত, তার কর্ম্ম-প্রেরণা ভোগ-প্রেরণা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই মানুষের জীবনেরও ঐ সত্য—তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবন্মৃত যে তার অন্তরেই নূতনের জন্যে আসন পাতা নেই—আর নূতনকে বরণ করে' নিতে নারাজ যে তারই মরণ।

"তিলে তিলে নূতন হোয়"। তাই জীবন এত মধুর—এত রসযুক্ত।

"আজ আমাদের সাধের বৃন্দাবন
নিত্য নূতন নূতন।"

এই যে জীবন-বৃন্দাবন তা নিত্য নূতন নূতন। নিত্য নূতন মুকুট মাথায় দিয়ে জীবন-দেবতা নিত্য নব রসে অভিষিক্ত হয়ে নিত্য নূতন পথে চল্‌ছেন। তাইত দেখি মানুষ অনন্ত—বাইরের রক্ত মাংস তার মনের পাতায় দাঁড়ি টানে নি। বাহিরকে সে অন্তরের অনন্ত রহস্যে মণ্ডিত করে নিত্য নূতনের খেলা খেল্‌ছে। তাই এই বাহিরের জগৎ তার অন্তরের রঙে "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

নতুন যেখানে আপনার পথ পায় নি—যেখানে সে অবজ্ঞাত হয়েছে—মানুষের মনে প্রাণে যেখানে সে ভয় বা তাচ্ছিল্য জাগিয়ে গিয়েছে—সেই খানেই পুরাতন ধীরে ধীরে মানুষকে জড়ে পরিণত করে' অমৃতের কাছ থেকে তাকে দূরে—অতিদূরে টেনে নিয়ে গেছে। মানুষের জীবনে অনন্ত সম্ভাবনার পথ সেখানে রুদ্ধ। সেখানে মানুষের আত্মার চাইতে মন—মনের চাইতে দেহের রক্ত মাংস বড় হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে তাকে মাটির দিকে টেনে নিয়ে গেছে—মাটিতে শিকড় গেড়ে তাকে উদ্ভিদে পরিণত করেছে—উদ্ভিদ ধীরে ধীরে পাথরে পরিণতি লাভ করেছে। নূতনের মধ্যে রয়েছে গতি—তাই সেখানে রয়েছে মানুষের কল্যাণ। তাই মানুষের জীবনের একটা বড় সত্য হচ্ছে ঐ—যে তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

(৩)

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

জন্ম ভরে' রূপ দেখলুম তবু নয়নের তৃপ্তি হ'ল না—নয়নের বৈরাগ্য এলো না। কারণ আমি যে সে-রূপ দেখে তিলে তিলে নতুন হচ্ছি—কারণ সে-রূপ যে আমার চোখে তিলে তিলে নতুন হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কি এ রূপ? কিসের এ রূপ? না দেখে জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিট্‌ল না—জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিট্‌বে না। এ রূপ কি শুধু ঐ মুখের? তার সুবিন্যস্ত পেশীসমূহের? নিটোল সুগোল গণ্ডের? নির্ভুল পরিমিত রেখাবন্ধনীর? শ্যাম দূর্ব্বাদলসন্নিভ বা চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণের? বনস্পতি সদৃশ উন্নত ঋজু দেহযষ্টি বা ললিত-লবঙ্গলতাতুল্য লীলায়িত দেহলতার?—না। তা যদি হ'ত তবে তা নিষ্ঠুর তৃপ্তি এনে সমাপ্তির গান গাইত। না, এ রূপ আমি সাদা চোখে খালি মুখেই দেখি নি—চোখের পিছনে যে মন আছে সেই মন দিয়ে দেখেছি—মনের পিছনে যে আত্মা আছে, সেই আত্মা দিয়ে স্পর্শ করেছি—তাই এ রূপের নম্বরতা নেই—তাই এ রাগের মাদকতার বিরতি নেই। ঐ বাইরের রূপের পিছনে, বাইরের রূপের অন্তরে, বাইরের রূপকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে—আমার অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে সেই অনির্ব্বচনীয়তার যোগ হয়েছে, তাই ও রূপের সৌন্দর্য্য জন্ম জন্মান্তরেও আমার কাছে মলিন হ'ল না—তাই ওর নেশা আমার লেগেই রইল—তাই

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

এ রূপ যদি কেবল রক্ত মাংসের রূপ হ'ত, তবে হিয়ার স্পন্দন থেমে গিয়ে দু'দিনে ক্রন্দন উঠ্‌ত।

কবি লিখ্‌ছেন—"যেখানে পদ্মফুলের নির্ব্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশী। * * *। পদ্মের যেখানে এই বেশী সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশীরও একটা গভীর মিল। তাই ত গাহিতে পারি

কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল!

গগন মগন হ'ল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে;
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;

নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল!"

মন কেবল ভুলিলই নয়—মন ভুলেই রইল—লাখ লাখ যুগ ভুলে রইল—জন্ম জন্মান্তর ভুলে রইল। এ কার গুণে? কিসের গুণে?—ঐ অনির্ব্বচনীয়তা, যারই কেবল জরা নেই, মৃত্যু নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। এ অনির্ব্বচনীয়তা বচনে বল্‌তে পারি নে—চেষ্টা করি মাত্র, বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি নে—দর্শন করি মাত্র, তাই ত

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

তাই

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

এই অনির্ব্বচনীয়তা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে এই জগতে। নইলে কোনদিন মানুষ সব ত্যাগ করে' নির্ব্বচনের জন্যে উৎগ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ত—চোখ বুঁজে সব তপস্যায় বসে' যেত—চোখ খুলে আর চাইতই না কোন দিকে। কিন্তু এই অনির্ব্বচনীয়তা তাকে যুগে যুগে ঔদাসীন্য থেকে মুক্তি দিচ্ছে—বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে আন্‌ছে। এই অনির্ব্বচনীয়তাই তার জীবনের গভীরতম সত্য, তাই চোখের অশ্রু মনের ব্যথা প্রাণের ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও সে বেঁচে এসেছে। কিন্তু এই অন্তরতম অনির্ব্বচনীয়তাকে আমাদের মন জানছে না, বুদ্ধি বুঝছে না। এই অনির্ব্বচনীয়তাকে মনে প্রাণে চিত্তে বুদ্ধিতে মানুষের সমস্ত প্রকৃতিতে সত্য করে' তোলা—জাগ্রত করে' তোলাই হচ্ছে মানুষের আজীবনের সাধনা।

(৪)

এই অনির্ব্বচনীয়তারই সন্ধান হিন্দু একদিন পেয়েছিল—এই অনির্ব্বচনীয়তার উৎস কোথায় তা টের পেয়েছিল। তাই সেদিন সে বাহির থেকে ভিতরে ফিরল। সেদিন সে খোলা চোখ বন্ধ করল—মন বুদ্ধিকে রুদ্ধ করল—হাত বাঁধল, পা বাঁধল। সেদিন সে পদ্মাসনে বসে' গেল তপস্যার অনির্ব্বচনীয়তার ঐ উৎসে পৌঁছিতে হবে—তাতে অবগাহন করতে হবে—জীবনের গভীরতম সত্যকে জানতে হবে।

বাহিরে তার দুর্গতির সীমা রইল না। তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি নিলামে চড়ল—তার সংসার অশ্রুতে অশ্রুতে সিক্ত হল, হাহাকারে হাহাকারে পূর্ণ হল—কুটীরের দ্বারে তার দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করাল বদন ব্যাদন করে' তাকে ভয় দেখাতে লাগল, মহামারী প্রেত তার যোগাসনের চারিদিকে অট্টহাস্য করে' করে' নাচতে লাগল—কিন্তু হিন্দু টলল না, যোগীর ধ্যান ভাঙল না—রক্তমাংসের দুঃখ, চোখের অশ্রু, প্রাণের ব্যথা মানুষকে জয় করতে পারল না—ধ্রুবতারার মতো একটি তারা শুধু তার ইচ্ছাশক্তির সামনে জ্বল্ জ্বল্ করে' জেগে রইল—ঐ অনির্ব্বচনীয়তাকে জানতে হবে—তার উৎসে পৌঁছিতে হবে—তাতে অবগাহন করতে সৃষ্টির নিগূঢ়তম সত্যকে আপনার করতে হবে। এমনি হিন্দুর একাগ্রতা, এমনি হিন্দুর শক্তি—এ শক্তি যেদিন বেরিয়ে এসে জগত-লীলায় মাতবে, সেদিন সে হবে অপরাজেয় অরিন্দম।

কিন্তু সকল সত্য অনুষ্ঠান মিথ্যাও কিছু জড়িয়ে আনে—যেমন প্লাবনের জল আবর্জ্জনারাশি জড়িয়ে আনে। তাই রব উঠল—ঐ

শেষ, ঐ অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার উৎসে পৌঁছা—ঐখানে সমাধি, মহাসমাধি—তারপর অক্ষর ব্রহ্মে নির্ব্বাণ মানব জন্মের চরম সার্থকতা।

কিন্তু ঐ শেষ নয়—অনির্ব্বচনীয়তা শেষ নয়—ওটা যে সৃষ্টির আরম্ভ—মানুষের ওটাই যে প্রারম্ভ। ঐ আরম্ভ থেকে মানুষকে অজ্ঞানে আরম্ভ করতে হবে। ঐ অনির্ব্বচনীয় উৎসে অবগাহন করে' দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে 'অমৃতময় করে' হিন্দুকে আবার বেরিয়ে আসতে হবে অমর হ'য়ে শক্তিমান হ'য়ে। সংসারের চোখের অশ্রু মিশিয়ে দিয়ে তার মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুলতে হবে—মহাজনের অনুচরকে দূর করতে হবে—মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে ঐ অনির্ব্বচনীয়তায় অভিষেক করে' সত্য করে' তুলতে হবে—মানুষের সে সত্যকে জগতে সার্থক করে' তুলতে হবে। বিশ্ববাসীকে ঐ অনির্ব্বচনীয়তার সংবাদ দিতে হবে—তার সন্ধান দিতে হবে। বিশ্ববাসী যে অনির্ব্বচনীয়তার উৎসে অবগাহন করে' অমর হ'য়ে সজ্ঞানে চোখ মেলে বসবে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

সে রূপের ব্যাখ্যান করে' করে' সে জন্ম-জন্মান্তর নবীনতা লাভ করবে—বিশ্ববাসী গৌরবোন্নতশিরে আবার একবার বলবে যে তারা হচ্ছে—অমৃতস্য পুত্রাঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাঙলা কি পড়্‌ব ?

প্রথম প্রস্তাব

(বন্ধু-সমাজে পঠিত।)

কি বই পড়্‌লে বাঙলা শেখা যায় ? তোমাদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত, বিশেষত আমার পক্ষে, কেননা আমি বাঙলা বই পড়ে বাঙলা ভাষা শিখি নি, বাঙলা ভাষা শিখেই বাঙলা বই পড়েছি। নিজের ভাষা শেখ্‌বার জন্য কারও কোন বই পড়া আবশ্যক কিনা, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে ; অপর পক্ষে কেবল মাত্র ও উপায়ে পরের ভাষা যে কতদূর শেখা যায়—তার প্রমাণ খুঁজে বার কর্‌তে আমাদের বেশি দূর যেতে হবে না ; তার অসংখ্য উদাহরণ আমাদের হাতের গোড়াতেই রয়েছে। আমরা ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরাজী ভাষাকে যে কতদূর আমলে এনেছি তা আমরা ঠিক না জান্‌লেও ইংরাজেরা ঠিক জানে। আমাদের ইংরাজী বিদ্যেয় ওকালতি ও এডিটরির ব্যবসা কোন প্রকারে চালান যায়, কিন্তু তার দৌলতে ইংরাজী সাহিত্য লেখা ত চলেই না, ঠিকমত পড়াও চলে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

তবে এ কথাও সত্য যে, যাঁর বইয়ের ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই—তাঁর ভাষাজ্ঞান অনেকটা আদিম। যে ভাষা তিনি জানেন তাতে করে ঘরকন্না চালান যায়, নিত্য জীবনের সুখ দুঃখ রাগ বিরাগ প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ সে ভাষার সম্বলে দিন চলে যায় এবং

সম্ভবত ভাল হালেই চলে যায় কিন্তু তাতে মানুষের মনের সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। এটা সুখের বিষয়ই হোক্, আর দুঃখের বিষয়ই হোক্, কথাটা কিন্তু সত্য যে, মানুষের জীবন একেবারে দৈনিক নয়, একমাত্র দিন-এনে দিন-খেয়ে মানুষ চরিতার্থ হয় না। তার স্বভাবের তাড়না থেকেই সে দর্শন বিজ্ঞান কাব্যকলার সৃষ্টি কর্‌তে বাধ্য হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ঐশ্বর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। সুতরাং যিনি সাহিত্য রচনা কর্‌তে চান কিম্বা সাহিত্য রস উপভোগ কর্‌তে চান, তাঁর পক্ষে বইয়ের ভাষার পরিচয় লাভ করাটা অবশ্য প্রয়োজন।

আমার এ কথা থেকে কেউ যেন মনে করো না যে, মুখের ভাষা ও বইয়ের ভাষা দুটি আলাদা ভাষা। এরূপ যাঁদের ধারণা, আমি তাঁদের জ্ঞাতিও নই, কুটুম্বও নই। মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা সম্পূর্ণ এক নয় কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণ বিভিন্নও নয়। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদটা যে কোথায় তা দু-কথায় বলা কঠিন। এ দুই য়র ভিতর একটি মোটাগোছের দাঁড়ি টান্‌বার জন্য মানুষের পক্ষে যতটা নির্ভীক হওয়া দরকার, আমি ততটা নই। কেননা নিত্য দেখ্‌তে পাই যে, লেখকের মর্জ্জি অনুসারে এ রেখা ক্রমান্বয়ে এগোয় ও পিছয়। সত্যকথা বল্‌তে গেলে, সাহিত্যের কোন একটি বিশেষ ভাষা নেই, প্রতি লেখকেরই একটি নিজস্ব ভাষা আছে ; কিন্তু এঁদের সকলের ভাষার অন্তরে একটি সাধারণ গুণ আছে, যার দরুণ যাঁরা সত্যিকার লেখক তাঁদের লেখা সাহিত্য নামে পরিচিত, এবং সে গুণের নাম হচ্ছে শ্রী। আমাদের দৈনিক জীবনের মৌখিক ভাষার চাইতে, সাহিত্যের ভাষার কান্তি ঢের বেশি পরিপুষ্ট, শ্রী ঢের বেশি

পরিস্ফুট। কিন্তু তাই বলে মুখের কথার সঙ্গে বইয়ের কথার পার্থক্য জাতিগত নয়। সুন্দরী স্ত্রীলোক ও অ-সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখ একই উপাদানে গড়া, নাক কান চোখ মুখ দুজনেরই আছে এবং কম্পাস দিয়ে মেপে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, সে সকলের মাপ জোখও প্রায় সমান, অথচ যাঁর চোখ আছে তিনিই জানেন যে, সুন্দরী ও অ-সুন্দরীর ভিতর একটি স্পষ্ট, শুধু স্পষ্ট নয়, একটি জাজ্বল্যমান প্রভেদ আছে। একটিকে দেখে মানুষে চমৎকৃত হয়, আর একটিকে দেখে তা হয় না। আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যে, যে লেখা পড়ে মানুষে চমৎকৃত হয়—সেই লেখাই কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য।

শ্রী কিসের উপর নির্ভর করে তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব—তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মুখশ্রী যেমন মুখের প্রতি অংশের পূর্ণবিকাশ, এবং সকল অংশের সঙ্গতি ও সুষমার উপর নির্ভর করে, কাব্যশ্রীও তেমনি ভাষার পূর্ণবিকাশ ও শব্দের সঙ্গতি ও সুষমার উপর নির্ভর করে। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, এতদতিরিক্ত লাবণ্য বলে আর একটি জিনিষ আছে, যা না থাক্‌লে কাব্যের বাহ্য-শ্রী থাক্‌তে পারে কিন্তু তার চমৎকারিত্ব থাকে না। এ কথায় আমিও সায় দিই, যদিচ এই লাবণ্য বস্তুটি কি তা যিনি জানেন না, তাঁকে তা বুঝিয়ে দিতে পারা কঠিন। এ হচ্ছে সেই জাতীয় বস্তু যার অস্তিত্ব আমরা জানি কিন্তু সে অস্তিত্বের রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন কর্‌তে পারিনে। তবে এ জিনিষের মূল যে কোথায় তা আমরা অনুমান কর্‌তে পারি। যা জীবন্ত নয়, সে পদার্থের অর্থাৎ জড়পদার্থের দেহে লাবণ্য নেই, এই থেকে আন্দাজ করা যায়, রূপের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে দিব্য আলো ফুটে ওঠে, তারই নাম

লাবণ্য। যে-লেখা লেখকের প্রাণে প্রাণবন্ত—সেই লেখার মধ্যেই শুধু লাবণ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাবে, অন্যত্র নয়। এই লাবণ্যই যে সাহিত্যের ভাষার সর্ব্বপ্রধান গুণ, এ জ্ঞান সে-সব লেখকদেরও আছে, যাঁরা রচনার ভিতর নিজের প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে পারেন না, কিম্বা কর্‌তে চান না। জড়বস্তুর লাবণ্যের অভাব আমরা যেমন পালিসের সাহায্যে পূর্ণ কর্‌তে চাই—উক্ত শ্রেণীর লেখকেরাও তাঁদের রচনার লাবণ্যের অভাব তেমনি পালিসের প্রসাদে পূর্ণ কর্‌তে চান। তার কারণ মাজাঘসার বলে আমরা ভাষাকে লাবণ্য না দিতে পারি—ঈষৎ চক্‌চকে করে তুল্‌তে পারি। ভাষার জলুস যদি ভাষার ভিতর থেকেই বার করা যায়, লোহাকে যদি ইস্পাত করা যায়, সেটা অবশ্য দুঃখের কারণ হয় না।

(২)

মুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার যোগাযোগ সম্বন্ধে এই দীর্ঘ বক্তৃতা কর্‌বার একটু বিশেষ কারণ আছে। সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে আমার মত আগে থাক্‌তেই জানিয়ে না রাখ্‌লে, আমি যে সব বইয়ের হয়ে তোমাদের কাছে সুপারিস কর্‌ব, তাতে তোমরা একটু বিস্মিত হয়ে যেতে পার। তোমরা যখন বাঙলা ভাষার উপর একটু পাকা রকমের অধিকার লাভ কর্‌বার জন্যই বাঙলা বই পড়্‌তে চাও, তখন আমি তোমাদের বাঙলার চর্চ্চা "মেঘনাদ বধ" থেকে সুরু কর্‌তে বলব না—ও-কাব্যে শেষ কর্‌তে বল্‌ব, আর গোড়ায় এমন সব বই পড়্‌তে অনুরোধ কর্‌ব, যে সকল পুস্তকের এদেশের স্কুল কলেজে প্রবেশের অধিকার নেই।

বোধহয় তোমরা জান যে, আমি সাধু-বাঙলার পক্ষপাতী নই; কেননা আমি শুদ্ধ-বাঙলার পক্ষপাতী। সাধু-বাঙলার সঙ্গে শুদ্ধ-বাঙলার প্রভেদটা যে কোথায়, সে বিচার আমি পরে করব। আপাতত একটি কথা মনে রাখলে আমার মত গ্রাহ্য করবার পক্ষে না হোক্, বোঝবার পক্ষে তোমাদের কতকটা সাহায্য হবে। তোমরা সবাই জান যে, ভাষা মাত্রেরই একটি বিশেষ সুর, একটি বিশেষ ছন্দ, একটি বিশেষ মতি, একটি বিশেষ গতি, এক কথায় একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে; এবং আমার বিশ্বাস, সাহিত্যের ধর্ম্ম হচ্ছে, ভাষার সেই সুরকে ভরাট করা, সেই ছন্দকে জমাট করা, সেই মতিকে প্রসন্ন করা, সেই গতিকে প্রমুক্ত করা,—এক কথায় তার প্রকৃতিকে প্রকৃত করা। প্রকৃতিকে প্রকৃত করার প্রস্তাব, হঠাৎ শুনতে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। বহুকাল পূর্ব্বে আরিষ্টল বলে গেছেন যে, বস্তুমাত্রেরই প্রকৃতির পরিচয় আমরা তখনই পাই—যখন সে বস্তুর অভিব্যক্তি পূর্ণ হয়। আর ভাষা একমাত্র সাহিত্যেই তার পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃত হয়ে ওঠে।

(৩)

এ যুগের বাঙলা-সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত যে-ভাষার দখলে রয়েছে, সে-ভাষা সংস্কৃত শব্দের গুরুভারে ভারাক্রান্ত, যুগপৎ ইংরাজি ও সংস্কৃত অন্বয়ের বন্ধনে তা আবদ্ধ। সুতরাং যাঁরা বাঙলা ভাষার মূল উপাদান ও মূল প্রকৃতির পরিচয় লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, প্রতি ভাষারই একটি বিশেষ সুর আছে, এবং যে লেখার ভিতর সে সুর বাজে না, তা দর্শন বিজ্ঞান যা খুসি তাই হতে পারে; কিন্তু সাহিত্য নয়। বাঙলা গদ্যের ভাষা অত্যধিক সাধু হয়ে যে শুধু জড়ভরত হয়ে পড়েছে, তাই নয়,—সেই সঙ্গে তা নিতান্ত বেসুরোও হয়ে পড়েছে। আমাদের কানে যে তা বেসুরো লাগে না, তার কারণ আমাদের নব শিক্ষার প্রসাদে, বাঙলা ভাষার নিজস্ব সুরটি শিক্ষিত বাঙালীর কান থেকে আলগা হয়ে গিয়েছে।

এ কথা যদি সত্য হয়, ত অপর কোনও কারণে না হোক্, যাতে বাঙলা ভাষার সুর আবার আমাদের কানে ফিরে আসে, অন্তত সে কারণেও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের পঠন পাঠন শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

যেমন সঙ্গীতের সুর আদায় করতে হলে, যত না তা এস্তমাল করা দরকার, তার চাইতে ঢের বেশি তা শোনা দরকার। তেমনি কোনও ভাষার সুর আদায় করতে হলে, যত না তা বলা দরকার তার চাইতে ঢের বেশি তা শোনা দরকার। ক্রমান্বয়ে শুনতে শুনতে সে সুর আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের কানে গেঁথে যায়—মনে বসে যায়। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের কাছে যত জিনিষ না ধরা পড়ে, আমাদের মগ্ন চৈতন্যের কাছে তার চাইতে ঢের বেশি জিনিষ ধরা পড়ে। আমরা যাকে জ্ঞান বলি, তার যে অংশ আমরা সজ্ঞানে শিক্ষা করি, তার চাইতে তার যে অংশ অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়, তার মূল্য কম নয়। অপর বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা খাটুক আর না খাটুক, আর্টের শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ খাটে।

এই কারণে তোমাদের সঙ্গে আমি আমাদের প্রাচীন কবিদের সর্ব্বপ্রথমে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

(৪)

আমরা যাকে বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য বলি, সে হচ্ছে বাঙলার নবাবী আমলের সাহিত্য।

হিন্দু যুগের যদি কিছু বাঙলা সাহিত্য থেকে থাকে তা আজ পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কাটামুণ্ডু থেকে কতকগুলি গান ও শ্লোক সংগ্রহ করে এনেছেন, যা না কি বাঙলা সাহিত্যের আদিম নমুনা। এ ছাড়া 'শূন্যপুরাণ' বলে একখানি বই আছে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে, যার জন্মকাল হচ্ছে পাল রাজাদের কাল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পদাবলী সম্ভবত হিন্দুযুগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু এ গান ও এ শ্লোকের ভাষা বাঙলা কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অপরপক্ষে "শূন্যপুরাণ"-এর ভাষা অবশ্য বাঙলা এবং খাঁটি বাংলা কিন্তু ও গ্রন্থ যে মুসলমান আমলে রচিত হয়েছিল সে বিষয়েও কোনই সন্দেহ নেই। কেন ?—সে তর্ক এখানে তুল্‌ব না। 'শূন্যপুরাণ' তোমরা ইচ্ছে করলে পড়্‌তে পার কিন্তু না পড়্‌লেও ক্ষতি নেই।

গৌড়ের তক্তের মালিক যখন বাদশা, বাঙলা সাহিত্য যে সেই সময়ে জন্মলাভ করে, এই হচ্ছে—মামুলি মত। এবং এই মত শিরোধার্য্য করে এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক্।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের রত্নাবলী হচ্ছে পদাবলী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করবার যোগ্যতা

বাঙলার গীতিকাব্যের আছে। সুতরাং একথা বলাই বেশি যে, বাঙালী পাঠক মাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে সে সাহিত্যের রসাস্বাদ করা।

তবে এ ক্ষেত্রে একটু মুস্কিল আছে। এ সাহিত্যের দর্শনলাভ করা সুকঠিন। পদাবলী সাহিত্য বটতলায় পাওয়া যায়, পটলডাঙ্গায় পাওয়া দুষ্কর। আর বটতলার ছাপা যেমন বিশ্রী তেমনি ভুল। ভদ্রলোকের হাতে দেওয়া যায়, এমন একখানি চণ্ডিদাস খুঁজে বার করতে অন্তত সাতদিন লাগে। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ চণ্ডিদাসের একটি নবসংস্করণ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার উপর নির্ভর করা আদপেই চলে না। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় চণ্ডীদাসের নামে কত বাজে কবির কত খেলো পদ যে চালিয়ে দিয়েছেন, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। এ সংস্করণে তিনি মণি-কাঁচের যে যোগসাধন করেছেন, পাঠককে তাহার বিয়োগ সাধন করতে হবে। এই পোকা বাছবার মজুরি ক'জনের পোষায় ?

পদাবলীর ভাষা হচ্ছে, ইংরাজীতে যাকে বলে poetic diction. এ সাহিত্যের যে সুর সে হচ্ছে বাঁশীর সুর, মানুষের গলার আওয়াজ নয়। সুতরাং বাঙলার কথার সুরের সন্ধান নিতে হলে, আমাদের অপর সাহিত্যের কাছে যেতে হবে। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য আগাগোড়া পদ্যে লেখা, তাই বলে তা অবশ্য আগাগোড়া কবিতা নয়। সুতরাং বাঙলা ভাষায় কান তৈরি করতে হলে, আমাদের সেই পদ্য সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা করা আবশ্যক—যা গদ্যে লিখ্‌লেও চলতে পারত।

কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" ও কাশিদাসের "মহাভারত" যে সকলেরই পড়া দরকার এ বিষয়ে আমি সকলের সঙ্গে একমত। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের

মতে কৃত্তিবাস ও কাশিদাসের যে কাব্য আমরা পড়ি তার ভাষা যথেষ্ট প্রাচীন নয়। যুগে যুগে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে, এখন তা প্রায় আধুনিক হয়ে এসেছে। এ কথা আমিও মানি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। চল্‌তি রামায়ণ ও চল্‌তি মহাভারতের ভাষা খুব সেকেলে না হলেও একেবারে একেলে নয়। ও-দুই গ্রন্থের ভাষা খাঁটি বাঙলা। "পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি" প্রভৃতি দু' এক টুকরো ওর ভিতর এখানে ওখানে প্রক্ষিপ্ত হলেও, ও-দুই কাব্যের সুর, খাঁটি দেশীই রয়ে গিয়েছে। এখানে একটি কথা বলে রাখি, বাঙলা রামায়ণ মহাভারত আমি বহুকাল পড়িনি। বাল্যস্মৃতির উপর নির্ভর করেই আমি তার সুখ্যাতি কর্‌ছি।

(৫

এর পর আমি এমন একখানি গ্রন্থের উল্লেখ কর্‌ব, যার সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের অল্প লোকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমার মতে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" বাঙলা সাহিত্যের একখানি অপূর্ব্ব ত বটেই উপরন্তু অমূল্য গ্রন্থ। আগেভাগেই বলে রাখি যে, ও-গ্রন্থ যদিচ পদ্যে লেখা তবুও কাব্য নয়। চৈতন্যদেবের এই জীবন চরিত লেখক, মহাপ্রভুর জীবনেরই পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন, নিজের কবিত্ব শক্তি প্রকাশ কর্‌তে চান নি। এর জন্য আমাদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা সে শক্তি তাঁর শরীরে ছিল না। এ গ্রন্থ গদ্যে লেখা হলে আমার বিশ্বাস এর মর্য্যাদা আরও বেড়ে যেত। বৃন্দাবন দাস ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির লোক, তাই ভাষার ও

ভাবের অপূর্ব্ব সরলতাই হচ্ছে তাঁর গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান গুণ। তা ছাড়া তিনি তাঁর জ্ঞান বিশ্বাসে যা সত্য বলে মনে করেছেন তাই বলেছেন। সহজ ভাষায় সত্য ঘটনার বিবরণ দিতে পার্‌লে, সে বিবরণ যে সাহিত্য হয়ে ওঠে—এই গ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস স্বেচ্ছায় লেখেন নি, নিত্যানন্দের আদেশে লিখেছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনা কর্‌তে চান নি বলে, তাঁর রচনা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এ রকম ঘটনা সাহিত্য জগতে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। "চৈতন্য ভাগবত" কাব্য নয়, কিন্তু বাঙলার একটি নব-যুগের এবং সেই নব-যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের ইতিহাস। এবং আমার বিশ্বাস প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে এই হচ্ছে একমাত্র ইতিহাস, এবং ইতিহাসের যে সকল গুণ থাকা উচিত এ গ্রন্থে সে সকল গুণের সাক্ষাৎ মিলবে। এস্থলে বলে রাখি যে, ইতিহাস শব্দ chronicle অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি, history অর্থে নয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে এ জাতের লেখাকে কর্‌চা বলে।

চৈতন্যদেবের অপর সকল জীবন চরিতের স্থান "চৈতন্য ভাগবত"-এর অনেক নীচে। "চৈতন্য-মঙ্গল"-এর রচয়িতা লোচন-দাস ছিলেন কবি, সে কারণ তার গ্রন্থে ইতিহাস উপন্যাসের সঙ্গে মিশে একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবন দাস চেষ্টা করেছেন—মহাপ্রভুর ছবি তুলতে আর লোচন দাস চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবি আঁক্‌তে, কাজেই তাঁকে ও-ক্ষেত্রে রঙ চড়াতে হয়েছে। তাঁর কল্পনার চাইতে চৈতন্য দেবের জীবনের সত্য যে ঢের বেশি মহৎ ও অপূর্ব্ব ছিল, এ জ্ঞান তাঁর থাক্‌লে তিনি মহাপ্রভুকে তাঁর স্বহস্ত রচিত অলঙ্কারে ভূষিত কর্‌তে গিয়ে আবৃত করে

ফেল্‌তেন না। চৈতন্য দেবের জীবন চরিতে, মহাপ্রভুকে দেখে নবদ্বীপের নারীগণের পতিনিন্দাটা, ভেবে দেখ দেখি, কি বেখাপ্পা শোনায়! তবুও এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য—তার ভাষার গুণে।

তারপর আসে "চৈতন্য চরিতামৃত"। এ গ্রন্থের বস্তু প্রথমত সাহিত্য নয়, এর ভাষা দ্বিতীয়ত বাঙলা নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখেছেন দর্শন এবং যে ভাষায় তা লিখেছেন, তার নাম আমি ঠিক জানিনে। এ ভাষাকে আধ-আধ বাঙলাও বলা যেতে পারে, বাধো-বাধো বাঙলায়ও বলা যেতে পারে। এই ভাষা-বিভ্রাটের জন্য তাঁকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। তিনিও এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন গুরুর আদেশে। এবং গুরু যখন তাঁর প্রতি এ আদেশ কর্‌লেন, তখন কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের বয়েস চৌরাশী বৎসর এবং বহু-কাল ব্রজবাসের ফলে, বাঙলা ভাষা তিনি এক রকম ভুলেই গিয়েছিলেন। "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনা কর্‌বার জুড়ি heroic act পৃথিবীর সাহিত্যে আর নেই। "চৈতন্যচরিতামৃত"-এর মাহাত্ম্য আমি সম্পূর্ণ বুঝি, ধর্ম্মগ্রন্থ হিসেবে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। তবুও এ গ্রন্থ পড়্‌তে আমি তোমাদের অনুরোধ কর্‌ব না, কেননা সে পাঠের ফলে বাঙলা শেখার বিশেষ সাহায্য হবে না।

একটা সুখবর দিই। "চৈতন্য ভাগবত"-এর একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আছে। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে গ্রন্থের সম্পাদক সে গ্রন্থ যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ও-সংস্করণটি আজকাল বাজারে মেলে কিনা জানিনে, আর যদিও বা মেলে, তাহলে তার দাম চার পাঁচ টাকার কম হবে না। আমার মতে যে বই প্রতি বাঙালীর পড়া উচিত, সে বই এমন দুর্লভ

ও দুর্মূল্য হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আদর হালে শিক্ষিত সমাজের এক সম্প্রদায়ের কাছে শুন্‌তে পাই যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। যাঁরা এ সাহিত্যের গুণগানে শতমুখ, তাঁদের কাছে আমার সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁরা "চৈতন্য-ভাগবত"-এর একটি সুলভ ও সুদৃশ্য সংস্করণ প্রকাশ করুন। পদাবলীকে রগড়ে কচলে তার ভিতর থেকে রসতত্ত্ব বার করবার চেষ্টা, কাব্য নিঙড়ে দর্শন বার করবার চেষ্টা যে, শুধু নিস্ফল তাই নয়,—ঐ রগ্‌ড়ানি কচ্‌লানির ফলে, তার মধুর রস দেশের লোকের কাছে তিতো হয়ে উঠ্‌তে পারে। অপর পক্ষে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটায় সমাজ ও সাহিত্য দুয়েরই যথেষ্ট উপকার করা হবে। তবে এ অনুরোধ যে কেউ রক্ষা কর্‌বেন, সে ভরসা আমার নেই—কেননা যাঁরা পদাবলীমুগ্ধ তাঁরা পদাবলীরও ত কৈ, অদ্যাবধি কোনও সুলভ ও সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ কর্‌লেন না!

(৬)

এতক্ষণ যে সব বইয়ের নাম কীর্ত্তণ করা গেল সে সবই গৌড়ের পাঠান বাদশাদের সময় লেখা হয়েছিল। এইবার মোগল যুগের দুখানি বইয়ের কথা বল্‌ব, এক মুকুন্দরামের "চণ্ডী" আর এক ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"।

"চণ্ডী"র বিশেষত্ব এই যে, এ হচ্ছে খাঁটি বাঙলা কাব্য। আজকাল দেখ্‌তে পাই একদল লোক খাঁটি বাঙালীর সন্ধানে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের রাজ্যে হাঁৎড়ে বেড়াচ্ছেন। ও-জীবটিকে আন্‌কোরা অবস্থায়

যদি কোথাও আবিষ্কার করা যায়, ত সে হচ্ছে চণ্ডীর উপাখ্যান ও মনসার উপাখ্যানের মধ্যে। রামায়ণ ও মহাভারত, প্রাচীন আর্য্য-জাতির বীরকাহিনী। তারপর বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর একদিকে ভাগবতের, আর একদিকে, বিদ্যাপতির পদাবলীর পূর্ণ-প্রভাব রয়েছে, এমন কি, সে প্রভাব পদাবলীর ভাষার অন্তরেও প্রবেশ করেছে। আমরা যাকে ব্রজবুলি বলি, তা ব্রজভাষা নয়, কিন্তু মৈথিলীর বাঙলা সংস্করণ। আসল কথা এই যে, খাঁটি বাঙালীর সাক্ষাৎ মানুষে তখনই পাবে, যখন বাঙালীজাতি তার পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে, অতীতে নয়।

"চণ্ডী"র কথা বাঙলা কথা, সুতরাং সে কথা প্রায় খাঁটি ঘরো বাঙলা-তেই বলা হয়েছে। এই "ঘরো" বিশেষণটি আমি অবশ্য নিন্দার্থে ব্যবহার করিনি। গার্হস্থ্য জীবন যেমন সামাজিক জীবনের মূল, গার্হস্থ্য ভাষাও তেমনি সামাজিক ভাষার মূল। কবিকঙ্কন ছিলেন গ্রাম্য কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে এমন ঢের শব্দ আছে যা সেকালে একমাত্র রাঢ় দেশের পল্লিগ্রামে প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত একালেও আছে। এই অপরিচিত এবং অবোধ্য শব্দগুলি, ও-কাব্য পাঠের পক্ষে আমাদের অনেকের কাছে একটা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরিজ্ঞাত, এমন কি অশ্রুতপূর্ব্ব অসংখ্য সংস্কৃত শব্দে গৌরবান্বিত বলে, বাঙালী পাঠকের জন্য "মেঘনাদবধ"-এর যেমন সটীক সংস্করণ বার করা হয়েছে, কবিকঙ্কনের "চণ্ডী"রও তেমনি একটি সটীক সংস্করণ বার করা উচিত। "মেঘনাদ বধ" অন্তত, "প্রকৃতিবাদ অভিধান"-এর, না হয়ত "শব্দ-কল্পদ্রুম"-এর সাহায্যে পড়া যায় কিন্তু "চণ্ডী" যে কোন্ অভিধানের সাহায্যে পড়তে হয় তার সন্ধান নিতে হলে "সাহিত্য পরিষদ"-এর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর

নেই। অথচ সে পরিষদে শিলালিপির অভিধান পাওয়া যেতে পারে, বাঙলার পাওয়া যাবে না।

এ কাব্যে যে বাঙলা-ভাষা শেখবার বিশেষ সাহায্য করে তার কারণ শুধু এ নয় যে, এর ভাষা অকৃত্রিম বাঙলা, এ কাব্যের শব্দ সম্পদ প্রচুর। পদাবলীর ভাষা অতি সঙ্কীর্ণ, তার সকল কথা জড় করলেও একমুঠোর বেশি হবে না, কেন না এ সাহিত্যের মুখ্য বিষয় হচ্ছে sex-love, এবং সে বিষয়ও পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ, মান ও পুনর্মিলনে পর্য্যবসিত। একখানি বড় কাব্য লিখতে হলে কিন্তু বহু বিষয়ের অবতারণা করতে হয়, সুতরাং বহুশব্দ ব্যবহার করতে হয়। কবিকঙ্কন সে কালের বাঙালী সমাজের ও বাঙালী জীবনের পট এঁকেছেন,—সুতরাং আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের নানা কথা তাঁকে বলতে হয়েছে। তাই বলে তাঁর কাব্য একমাত্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। পরিবারের বাইরে যে বড় সমাজ রয়েছে, সে সমাজের প্রায় সকল অঙ্গের বর্ণনাই, "চণ্ডী"র ভিতর পাওয়া যায়। চাষবাস, জমিদারী মহাজনী, শিল্প বাণিজ্য, এ সকলের কথাবার্ত্তা ও-কাব্যের মধ্যেত আছেই, কিন্তু তার চাইতে একটি ঢের বড় কথাও আছে,—সে হচ্ছে বাঙালী বণিকের সমুদ্র-যাত্রার কথা। এত ব্যাপারের বিবরণ অবশ্য একমুঠো কথায় দেওয়া যায় না।

যখন সাহিত্যের সাহায্যে ভাষা শিক্ষা করবার পদ্ধতির সার্থকতা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তখন এ প্রশ্ন সহজেই ওঠে যে, "চণ্ডীর" উপাখ্যান সাহিত্য কি না, আর যদি তা সাহিত্যও হয়, ত তা কাব্য কিনা?—

আমার মতে ও-গ্রন্থ সাহিত্যও বটে, কাব্যও বটে। কবিকঙ্কন উঁচুদরের কবি না হলেও কবি। এ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও

শব্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, এবং বীণাপাণির গুণগান করতে যাঁর মুখ দিয়ে, "বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি", এই সমস্ত শব্দ বেরিয়েছে, বাণীর কৃপায় তিনি বঞ্চিত নন। কবিকঙ্কনের ভাবের মধ্যে শক্তি নেই কিন্তু স্বাস্থ্য আছে, তাঁর ভাষার গায়ে যেমন রঙ নেই, তেমনি ঢঙও নেই, সে ভাষা সাদা। সে ভাষা শুধু সাদা নয়, সেই সঙ্গে সিধেও বটে। এই সাদাসিধে ভাবটাই কবিকঙ্কনের কাব্যের প্রধান গুণ।

(৭)

নবাবী আমলের শেষ কবি এবং চরম কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে-বস্তুর কণামাত্র নেই সে হচ্ছে সাদাসিধে ভাব। মুকুন্দরাম বাঙলার গ্রাম্য কবি, আর ভারতচন্দ্র নাগরিক। কবিকঙ্কন যেমন সরল, রায় গুণাকর তেমনি চতুর। তাঁর ভাব চতুর, তাঁর ভাষা চতুর, তাঁর ভঙ্গী চতুর। চাতুরীই হচ্ছে তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ। তাঁর বাক্‌চাতুরি অনন্য সাধারণ, কিন্তু তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিতে সদাই ব্যগ্র, তার বাঙলা নাম হচ্ছে চতুরালি।

"বিদ্যাসুন্দর" যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই, এবং থাকতেও পারে না; তার কারণ নিজের এ দোষ সম্বন্ধে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; তাই না তিনি তাঁর অশ্লীলতাকে সাধুভাষার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেকালে তিনি কাব্য রচনা করেন, সেকালে এদেশে কুরুচিতে বোধহয় সভ্যসমাজের অরুচি ধরে নি। কিন্তু দেখতে পাই যে, কারও কারও মতে ভারতচন্দ্রের এই

রুচি বিকারের কারণ তিনি পার্শীনবিশ ছিলেন। পারসিক সাহিত্য থেকেই নাকি তিনি অশ্লীলতা বঙ্গ-সাহিত্যে আমদানি করেন। এ অনুমান অমূলক কি সমূলক সে কথা আমি বলতে পারিনে, কেননা পার্শী-ভাষা আমি জানিনে, তার এক বর্ণও নয়। আমার বিশ্বাস যাঁরা এ মত প্রচার করছেন, পার্শী-ভাষা তাঁরাও জানেন না, তার এক বর্ণও নয়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমান প্রমাণ অভাবে অসিদ্ধ। তবে এ কথা আমি বলতে বাধ্য যে, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার নজির পার্শী দপ্তরে খুঁজতে যাবার কোনই প্রয়োজন নেই। এ সম্পদ তিনি সংস্কৃত কবিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী স্বত্বে লাভ করেছেন। যে দোষে ভারতচন্দ্র দোষী সে দোষ উত্তর-কুমারে আছে, "শিশুপাল বধে" আছে, "কিরাতার্জ্জুনীয়"তে আছে আর "নৈষধ"-এর অষ্টাদশ সর্গে ত ও-বস্তু তার শেষ সীমায় পৌঁচেছে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী কবিরাও কাব্যের এ দোষকে গুণ বলেই যে মনে করতেন তার প্রমাণ "গীত-গোবিন্দ" ও পদাবলী। ভারতচন্দ্র যে একা চোরদায়ে ধরা পড়েছেন, তার কারণ "বিদ্যাসুন্দর"-এর অদ্যাবধি কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। আর এক কথা, "বিদ্যাসুন্দর"কে কাব্যে স্থানও তিনি প্রথম দেন নি। এ বিষয়ে রামপ্রসাদ তাঁকে পথ দেখান। রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" ও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর"-এর চাইতে, এক তিল কম অশ্লীল নয়। তবে আজকের দিনে, রামপ্রসাদ যে পরম ধার্ম্মিক ও ভারতচন্দ্র যে চরম ইয়ার-কবি হিসেবে গণ্য তার কারণ, ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য ছিল, রামপ্রসাদের ছিল না, তাই রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আর ভারত-

চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" আজও বেঁচে আছে এবং সম্ভবত আরও বহুকাল থাকবে। "গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে। অপর পক্ষে রচনাশক্তির একান্ত অভাবটা রামপ্রসাদের "দোষ হয়ে গুণ হয়েছে"। ইতিহাসের আদালতের এ হেন বিচারকেই বোধ হয় ইংরাজরা বলেন—poetic justice!

কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ তার স্পষ্ট অশ্লীলতা নয়। "বিদ্যাসুন্দর"কে কাটছাঁট করেও তাকে নিষ্কলুশ করা যায় না। ভারতচন্দ্র বলেছেন :—

—"গিয়েছিনু নাগরীর হাতে
তারা কথায় মনের গাঁঠি কাটে।"

ভারতচন্দ্র এই নাগরীদেরই স্বজাতি। তাঁর কথাতেও মনের গাঁঠ কাটে, কেননা সে কথার মুখে হীরার ধার আছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের বাঁকা চাহনিও আছে। তিনি সকল কথা একটু কটাক্ষ করেই বলেন, এবং তাঁর সে কটাক্ষ শুধু মানুষের উপর নয়, দেবদেবীর উপরেও পড়েছে। সমাজ বলো, নীতি বলো, ধর্ম্ম বলো, এ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর ঠাট্টার সম্পর্ক। যেখানে তিনি মন খুলে হাস্‌তে সাহস করেন নি সেখানে তিনি মুচ্‌কে হেসেছেন। তাঁর সরস্বতীর এই চোরা হাসি, এই চোখ-ঠারা ভাবটাই হয়ত আমাদের মনকে তার প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল হতে দেয় না। গোটা "অন্নদামঙ্গল" অবশ্য সুকুমার মতি বালক বালিকার পাঠ্যপুস্তক নয়, কিন্তু যাদের মন কচিও নয় কাঁচাও নয়, তাঁদের কাছে এক ভাষার গুণেই ভারতচন্দ্রের কাব্য চির-শ্রদ্ধার ও চির-আদরের সামগ্রী।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সম্বন্ধে যেমন দ্বিমত নেই, তাঁর ভাষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও তেমনি দ্বিমত নেই। কি গুণে এ ভাষা এত চমৎকার, সেই বিষয়ে, কিঞ্চিৎ আলোচনা করায় আমার বিশ্বাস সময়ের বৃথাব্যয় করা হবে না।

(৮)

ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রথম গুণ এই যে, তাঁর ভাষা হচ্ছে বিশুদ্ধ বাঙলা। আমি তাঁর ভাষাকে এই কারণে বিশুদ্ধ বিশেষণে বিশিষ্ট করেছি যে, তা শুধু খাঁটি বাঙলা নয় সেই সঙ্গে শুদ্ধ ভাষা। ভাষা সম্বন্ধে এই শুদ্ধ শব্দটি সাধুবাদীরা যে অর্থে বোঝেন সে অবশ্য তার প্রকৃত অর্থ নয়। "ঘরের কথা"কে "গৃহের শব্দ" যিনি বলে সুখ পান তিনি বলুন, তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই কিন্তু "তদ্ভব"কে "তৎসম"-এ ফিরিয়ে দেওয়া মাত্র ভাষা যে উল্টো লাফে একদম শুদ্ধ হয়ে ওঠে, এই ভুলটা দেশশুদ্ধ লোক না করলেই আমরা খুসি থাকব।

তবে এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, সাহিত্য রচনা করতে বস্‌লে, মৌখিক ভাষাকে শোধন করে নিতে হয়, কিন্তু রূপান্তরিত করতে হয় না। যে সকল সাধুরা রূপোকে সোনাতে রূপান্তরিত করবার কৌশল জানেন, তাঁরা অতি কৌশলী হলেও যে সাধু নন, এ সত্যের পরিচয় ত আমরা পুলিশ কোর্টেও পাই। তবে শোধন ক্রিয়ার ফলে ভাষা যখন নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনই সে ভাষা শুদ্ধ হয়। কবিকঙ্কনের ভাষার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাষার তুলনা করলেই এই শুদ্ধতা কি বস্তু, তা সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কবিকঙ্কনের ভাষার অনেক

গ্রাম্য শব্দ, ও প্রাদেশিক শব্দ, অনেক শ্রুতিকটু শব্দ ও অসঙ্গত শব্দ বাদ দিয়ে, এক কথায় সে ভাষার গাদ কেটে নিয়ে, ভারতচন্দ্র তাঁর পরিষ্কার ও টলটলে ভাষা লাভ করেছেন। হাতের লেখার সৌন্দর্য্য যেমন অক্ষরের সরলতা, বিরলতা, সমতা ও সমশীর্ষতার উপর নির্ভর করে, রচনার সৌন্দর্য্যের তেমনি শব্দের সরলতা, বিরলতা, সমতা ও সমশীর্ষতার উপর নির্ভর করে। ভারতচন্দ্রের হাতে পড়ে বাঙলা-ভাষা ছাপার অক্ষরে পরিণত হয়েছে। ছাপার অক্ষরের সঙ্গে ছোট বড় অক্ষরের জড়ানো হাতের লেখার যে প্রভেদ, ভারতচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে কবিকঙ্কনের ভাষার সেই প্রভেদ। "চণ্ডী"র ভাষা খাঁটি বাঙলা কিন্তু সেই বাঙলা "অন্নদামঙ্গল"-এ তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

(৯)

তোমরা সবাই জানো যে, ভাষার মূল উপাদান পদ নয় বাক্য, word নয় sentence, এবং জীবের যেমন দেহের গঠন ভেদেই তার জাতিভেদ হয়, ভাষারও তেমনি বাক্যের গঠন ভেদই তার জাতিভেদের কারণ। ভাষার জাতরক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তার গঠন সাব্যস্ত রাখা। আজকাল আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে ভাষাকেও এক শ্রেণীর জীব বল্‌তে শিখেছি, কেননা হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে দেহীর সঙ্গে, আপাতদৃষ্টিতে ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে; জীবের মত ভাষারও একটা ইভলিউসান আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা আমাকে মাপ করবেন, এই জীবধর্ম্ম ভাষার উপর আরোপিত হয়েছে—ও ধর্ম্ম তার প্রকৃতিগত নয়। সাদৃশ্য ও সাম্য যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান সকল বৈজ্ঞানিকের থাক্‌লে, তাঁরা জড়ের ধর্ম্ম

জীবে এবং প্রাণের ধর্ম্ম মনে আবিষ্কার কর্‌তেন না এবং তাঁদের হাতে পাকা বিজ্ঞান কাঁচা দর্শন হয়ে পড়্‌ত না। জীবদেহের গঠন ও ক্রমপরিবর্ত্তন হয় নৈসর্গিক নিয়মে, কিন্তু ভাষা গড়ে মানুষে; সুতরাং মানুষে ইচ্ছামত তার গঠনও পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে, সে পরিবর্ত্তনের ফলে তার রূপ কখনও বা খুলে যায় কখনও বা ঢাকা পড়ে, কিন্তু তাতে তার প্রাণ নষ্ট হয় না।

ইংরাজরা বলেন, "তাঁরা খান ভাত", আমরা বলি "আমরা ভাত খাই"। অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মটা আসে আগে আর ক্রিয়াটা পড়ে শেষে। অপর পক্ষে ইংরাজদের ক্রিয়া আসে আগে আর কর্ম্ম তাকে অনুসরণ করে। এদেশের জনৈক নামজাদা পেট্রিয়ট এই ক্রিয়াকর্ম্মের পূর্ব্ব পশ্চাৎ ব্যবস্থা থেকে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য জাতির মন ও চরিত্রের অবস্থা নির্ণয় কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। ঐ বাক্যের গঠনের প্রভেদ থেকে তিনি ইংরাজ ও বাঙালীর মনের গঠনেরও ভেদ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেন ভাতকে যখন আমরা অগ্রগণ্য করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই বেশি Spiritual, আর ইংরাজরা যখন খাওয়াটাকে অগ্রগণ্য করে, তখন তারা নিশ্চয়ই বেশি materialistic. আহার যে matter, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আমি ও-ব্যাপারকে এক রকম ক্রিয়া অর্থাৎ motion বলেই জান্‌তুম ও সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করি যে, ভাত বস্তুটা যে Spirit সে জ্ঞানও আমার ছিল না। তবে এ কথা অবশ্য জান্‌তুম যে ভাত থেকে একরকম spirit জন্মায় ভাষায় যাকে বলে "ধেনো"। এ জাতীয় spirit যে আমাদের দেশের চাইতে ইউরোপে লক্ষ গুণে বেশি আছে, সে কথাও অস্বীকার কর্‌বার যো নেই। সে যাইহোক, আমার বক্তব্য এই

যে, বাক্যের গঠন, জীবদেহের গঠনের, অনুরূপ হলেও এক জাতীয় নয়। আমরা জীব নামক অবয়বীর এক অবয়বের স্থানে, আর এক অবয়বের সংস্থান করতে পারি নে, কিন্তু "আমি ভাত খাই" না বলে "আমি খাই ভাত" অনায়াসে বলতে পারি, এবং আবশ্যক হলে বলেও থাকি। স্থল বিশেষে গঠনের এ হেন বিপর্য্যয়ে বাক্যের যে তেজবৃদ্ধি হয় তার একটি চলতি উদাহরণ দেওয়া যাক্। "আমি খাই ঘাটে জল, তুমি খাও ভাঁড়ে"—এ বচন প্রসিদ্ধ। এ কথা বললে বঙ্গ-সরস্বতীর জাত মারতে একমাত্র তাঁরাই উদ্যত হবেন, যারা ভাষার তোলা জল ব্যাকরণের ভাঁড়ে খান। এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রচনায় স্বভাষার গঠন বজায় রাখবার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, সে গঠন পরিবর্ত্তন করাতে লেখকেরা জীবহত্যার পাপে লিপ্ত হন না। তবে ভাষার মৌখিক গঠন লেখায় যতদূর সম্ভব রক্ষা করবার সার্থকতা এই যে, তাতে করে রচনা প্রথমত দুর্ব্বোধ হয় না, দ্বিতীয়ত তা শ্রুতিকটু হয় না। ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মন ও কান দুই-ই যে ধরণের বাক্য শোনায় চিরদিন অভ্যস্ত, যতদূর সম্ভব রচনায় সেই ধরণের বাক্যই ব্যবহার করা শ্রেয়। ভাষা জিনিষটে বক্তার একলার সম্পত্তি নয়, শ্রোতাও তার অংশীদার। শ্রোতা ও বক্তা এ দু'য়ের দু' হাত না মিললে তাতে ভাষার তালি বাজে না। তা ছাড়া লেখকদের পক্ষে, লেখার চাল মুখের চালের অনুরূপ করাই নিরাপদ। ডিগবাজি খেতে গিয়ে লোকে সাহিত্যক্ষেত্রেও চিৎপাৎ হয়।

একজাতীয় সকল জীবের গঠন এক হলেও সকলের গড়ন এক নয়, কারও গড়ন সুন্দর কারও বা কুৎসিৎ, আবার কারও বা না-এদিক না-ওদিক। ভাষার মূল গঠন এক হলেও প্রতি লেখকের লেখার গড়ন

এক নয়। কোন রচনার গড়ন সুন্দর, কোনটির বা কুৎসিৎ আবার কোনটির বা চোখে পড়বার মত দোষ গুণ কিছুই নেই।

ভাষার গড়নের সৌন্দর্য্য অবশ্য তার রচনার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে শব্দের বন্ধন, তাদের পরস্পরের সঙ্গতি, সুষমা ও ঐক্যের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অতুল। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে কেউ বাঙলা-ভাষাকে তাঁর তুল্য সুন্দর ও সুঠাম গড়ন দিতে পারেন নি। এই আর এক কারণ যার জন্যে নির্ভয়ে বলা যায় যে, বাঙলা-ভাষার প্রকৃতি ভারতচন্দ্রের হাতে প্রকৃত হয়ে উঠেছে। যাকে আমরা ভাষার গঠন বলি, সে হচ্ছে তার মোটা গড়ন, তার অন্তরে ঢের জড়তা ঢের আড়ষ্টতা আছে। ভারতচন্দ্রের লেখনীর স্পর্শে সে ভাষার হাত-পায়ের খিল খুলে গিয়েছে, তার গতি পূর্ণমাত্রায় স্বচ্ছন্দ হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বলে বাঙলা-ভাষার matter শুদ্ধ হয়েছে, তার motion মুক্ত হয়েছে, এক কথায় সে ভাষা তার স্বরূপ লাভ করেছে।

(১০)

যাঁদের করস্পর্শে ভাষা তার স্বরূপ লাভ করে, তাঁদেরই আমরা আর্টিস্ট বলি। এবং এই সূত্রেই, আমরা ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান নয়, একমাত্র আর্টিস্ট বলি। কিন্তু এ কথা বলায় যে কি বলি, সে বিষয়ে আমাদের যে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা আছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সাহিত্যরাজ্যে আর্ট শব্দের পরিষ্কার অর্থ আমাদের যদি জানা থাকত, তাহলে কে কবি আর কে

আর্টিস্ট, এ নিয়ে পরস্পরের এত মতভেদ হত না। আমরা বলি, যাঁর ভাবের ঐশ্বর্য্য বেশি তিনি কবি, আর যাঁর ভাষার সৌন্দর্য্য বেশি তিনি আর্টিস্ট। এ উক্তি কিন্তু সন্তোষজনক নয়। যাঁর ভাব আছে, কিন্তু ভাষা নেই, এমন ব্যক্তি কবি হতে পারেন না, আর যাঁর ভাষা আছে অথচ ভাব নেই, এমন ব্যক্তিও আর্টিস্ট হতে পারেন না। মন নামক পদার্থ এবং সেই মনকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য, এই দুয়ের গাঢ় মিলন না হলে, সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। তারপর মনের ভাবেরও যেমন অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে, ভাষার রূপেরও তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে, শুধু তাই নয়, বিশেষ বিশেষ ভাবের আবার বিশেষ বিশেষ রূপ আছে।

যে কবি কাব্যে আত্ম-প্রকাশ করেন, অর্থাৎ যে কবি subjective তাঁর ভাষা এক ধাঁচের, আর যে কবি বাহ্যবস্তু নিয়ে কারবার করেন, (অপর লোকও সব বাহ্যবস্তুরও অন্তর্ভূত),— অর্থাৎ যে কবি objective, তাঁর ভাষা আর এক ধাঁচের। এঁদের একজন রচনা করেন গীতি-কাব্য আরেকজন কথা-কাব্য। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর কবির আর্টও স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করা যাক। গায়ক-কবির আর্ট সঙ্গীতের কোঠায় পড়ে। আর কথক-কবির আর্ট হচ্ছে, মূর্ত্তি গড়বার আর্ট, তাই কথক-কবিদের আর্ট, ইংরাজিতে যাকে বলে plastic art, তারই কোঠায় পড়ে। এ জাতীয় কবিরা কাব্যের গড়নের উপরই বেশি ঝোঁক দেন। এ হিসেবে অবশ্য তাঁদের আর্টিস্ট এবং অন্যদের কবি বলা যেতে পারে। এবং এই হিসেবেই ইংরাজ কবিরা বড় কবি, আর ফরাসী কবিরা বড় আর্টিস্ট, এবং এই হিসাবেই, ভারতচন্দ্র অপেক্ষা চণ্ডিদাস বড় কবি, আর ভারতচন্দ্র চণ্ডিদাসের চাইতে বড় আর্টিস্ট। এ দুয়ের ভিতর আর একটি প্রকাণ্ড প্রভেদ

আছে। Lyric কবিতার ধর্ম্ম গদ্যের ভিতর আনা যায় না। এ ক্ষেত্রে একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ করবার চেষ্টা যে কেবল বৃথা তা নয়, বিপজ্জনকও বটে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের আর্টের গদ্যেও স্থান আছে, কেন না এ কাব্যের মুখ্য বস্তু হচ্ছে কথা, আর তার ভাষা গদ্য-ঘেঁসা।

আর এক কথা। এ আর্ট কতক পরিমাণে শেখাও যায়, শেখানোও যায়, লিরিকের আর্ট কিন্তু প্রতি কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত কবির রসনা, "মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে"। এ আর্টের উপাদানও আমাদের হাতে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। কোনও কোনও রাগিণীতে মধ্যমের বদলে কড়িমধ্যম লাগালে তার শ্রী কেন ফিরে যায়, এবং কোন কোনও রাগিণীতে কোমল রেখাবের বদলে শুদ্ধ রেখাব লাগালে তার সুর কেন আরও কোমল হয়ে আসে, তার কারণ কি কেউ নির্দ্দেশ করতে পারেন? এ ক্ষেত্রে মানুষের instinct-ই হচ্ছে যথার্থ আর্টিস্ট, এবং গান রচনায় রচয়িতার কানই হচ্ছে আসল গুণী। যাঁর কান ও মন একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ নয়, তার হাতে আর যে কবিতাই হোক লিরিক জন্মলাভ করে না। কথক-কবিদের আর্টের সন্ধান আমরা কতকটা জানি, কি কি গুণে তাঁদের লেখা আর্ট হয়েছে তা আমরা ধরতে পারি। বস্তুর মত ভাষারও গড়ন অবশ্য তার উপাদান সাপেক্ষ। সঙ্গীতের উপাদান ত হাওয়া কিন্তু মূর্ত্তি গড়বার জন্য স্থূল পদার্থ চাই। রাগ-রাগিণী অশরীরী, ও মূর্ত্তি-শরীরী। দুয়ের ভিতর এই মূল প্রভেদ, এবং এ প্রভেদ যথার্থই আসমান জমিন প্রভেদ।

পাষাণের মূর্ত্তির গড়ন যতটা পরিচ্ছন্ন হয়, মাটির মূর্ত্তির তা হয় না, তারপর যে-সে মাটিতে মূর্ত্তি গড়া যায় না, তার জন্য চাই ইটল মাটি

অর্থাৎ গড়নের জন্য, উপাদানের কাঠিন্য হচ্ছে তার একটি মহাগুণ। বাঙলা-ভাষার একটি মহাদোষ এই যে তা বাঙলার মাটির মত কতকটা জলো ও এলো। এ ভাষাকে ইচ্ছে করলে নমনীয় কমনীয়, প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বিশেষণে অভিহিত করতে পারো, কিন্তু তাতে তার প্রকৃতি সমানই থেকে যাবে। এই নরম ভাষাকে বৈষ্ণব কবিগণ, আরও নরম করে নিয়ে এসেছেন, যা স্বভাবতই কোমল তাকে অতি কোমল করে এনেছেন। বৈষ্ণব কবিরা "খানি", "টুকু" প্রভৃতি উপসর্গের অতিপ্রয়োগে বাঙলাকে একটি আদুরে ভাষা করে তুলেছেন। যে ভাষার "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনি বহিয়া যায়" সে গড়ানো ভাষার কোনও গড়ন দেওয়া যায় না, কিন্তু তাতে গান গাওয়া যায়। যে ভাষায় "রামায়ণ" "মহাভারত" "চণ্ডী" প্রভৃতি লেখা হয়েছে, সে ভাষা কিন্তু তরল হলেও অতিতরল নয়, পারার মত তা তরল পদার্থ হলেও স্থূলপদার্থের কোঠাতেই গিয়ে পড়ে। এই ভাষাই হচ্ছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের মূল উপাদান। শুনতে পাই সন্ন্যাসীরা পারার শিব গড়িয়ে পূজো করেন। ভারতচন্দ্রও এঁদের মত পারা জমাবার সন্ধান জানতেন। এর জন্য বাঙলা-ভাষার সঙ্গে তাঁকে কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের খাদ মেশাতে হয়েছে, কিন্তু সে খাদ এত উচিতমাত্রায় এত বেমালুম করে মেশান হয়েছে যে, তাঁর ভাষার অন্তরে কি বাহিরে, কোনরূপ ধাতুবৈষম্য ঘটে নি। তাঁর কাব্যে বাঙলা ভাষার সুর পুরো বজায় আছে। তাঁর বীণার মূল-তার হচ্ছে বাঙলা, সংস্কৃত ও ফার্সির তরফের তার চড়ানোতে সে বীণার সুরের সুধু বেশি খোলতাই হয়েছে। আনাড়ীর হাতে এই বাঙলা সংস্কৃতের সংযোগে ভাষা যে কতদূর উৎকট হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর"-এ দেখতে পাবে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সুরের অবশ্য কোনও গাম্ভীর্য্য নেই, তার কারণ তাঁর কাব্যের বিষয়েরও কোনরূপ গাম্ভীর্য্য নেই। তাঁর ভাষা তাঁর ভাবের মতই হাল্কা, এত হাল্কা যে সময়ে সময়ে তা ছিবলেমির কাছ ঘেঁসে যায়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তার বিশিষ্টতা নষ্ট হয় না, তা ইতর হয়ে পড়ে না। তাঁর ভাষা ফুরফুরে কিন্তু জ্যলজেলে নয়, ঝরঝরে; কিন্তু খট্‌খটে নয়। এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে ভারতচন্দ্র গৎ-তোড়ায় তাঁর হাত তৈরি করেছিলেন, রাগের সাধনা তিনি কখনো করেন নি। ইচ্ছে করলে তিনি যে আলাপেও সিদ্ধ হস্ত হতে পারতেন, তার ইঙ্গিত তার কাব্যের ভিতরই পাওয়া যায়। সে যাই হোক্ বাঙলা ভাষার সুর ও ছন্দের গুণের পরিচয় নিতে হলে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্র ছাড়া আর দ্বিতীয় গুণী নেই, যার শরণ আমরা গ্রহণ করতে পারি।

এ প্রবন্ধ শেষ করবার আগে আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে রামপ্রসাদের গান ক'টি বাঙলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। এ গানের ভাষা ভাব, সুর সবই হচ্ছে খাঁটি বাঙলা। এর ভাষার ভিতর ব্রজবুলির ভেজাল নেই, এর ভাবের অন্তরে বৃন্দাবনের প্রভাব নেই, এর সুরের গায়ে হিন্দুস্থানী ঢঙ নেই; অথচ গান হিসেবে ভাবে ও ভাষায় এর তুল্য অকৃত্রিম ও অকপট ও জোয়ালো-সাহিত্য প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে আর নেই। রামপ্রসাদের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এ সাহিত্য আগাগোড়া মর্দ্দানা—এ গুণ বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ।

ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" প্রকাশিত হবার পর রামপ্রসাদের জ্ঞান হল যে, ও-শ্রেণীর কাব্য রচনা করা তাঁর কর্ম্ম নয়। এই সুবুদ্ধি

হওয়াতে তিনি, একসঙ্গে কথা-কাব্য ও সংস্কৃত-ভাষা এ-দুয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের মনের কথা, নিজের মুখের কথায় বল্‌তে কৃতসংকল্প হলেন। ফলে বাঙালীর চির আদরের ধন রামপ্রসাদের "গান" জন্মলাভ কর্‌লে।

"বিদ্যাসুন্দর"-এর রচনা শেষ হবার পর, ভারতচন্দ্রেরও যদি এরূপ সুমতি হত, তাহলে আমার বিশ্বাস তিনি বাঙলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে কতকগুলি অমূল্য লিরিক রেখে যেতে পার্‌তেন। যাঁর হাত থেকে "ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে, অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে"—এই গান বেরিয়েছে তাঁর লিরিকে গড়ন ও দরদ দু'-ই সমান থাক্‌ত। যে "বিদ্যাসুন্দর" লেখে তারও যে আত্মা থাক্‌তে পারে, তার প্রমাণ ত স্বয়ং রামপ্রসাদই রয়েছেন। "অন্নদামঙ্গল"-এরও সাক্ষাৎ সহজে মিল্‌বে না, ও-গ্রন্থেরও আবিষ্কার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তারপর বাজার হাঁট্‌কে যা পাওয়া যাবে, তার কাগজ খারাপ, ছাপা খারাপ, বানান ভুল ও পাঠ অশুদ্ধ। সে কালের যে-বই একালেও পাঠ্য তার বাইরের চেহারা যে সুন্দর হওয়া উচিত, এ জ্ঞান আমাদের আজও হয় নি। ইংরাজিতে যাকে বলে classics, তার আদর আমাদের কাছে যে নেই, তার পরিচয় তার চেহারা থেকেই পাওয়া যায়।

শুধু ছাপার রূপে অবশ্য classics-এর ভাল সংস্করণ হয় না। টীকা ভাষ্যের গুণেই তার আসল মর্য্যাদা। আমাদের পক্ষে টীকার সাহায্য বিনা "অন্নদামঙ্গল"-এর আদ্যোপান্ত মর্ম্ম উদ্ধার করা কঠিন। প্রথমত ও-কাব্যে বহু ফার্সি ও আরবি শব্দ আছে যার অর্থ এ যুগের বাঙালী ভুলে গিয়েছে। তারপর ভারতচন্দ্র বহু ঐতিহাসিক ঘটনার

উল্লেখ করেছেন, যার সত্যাসত্যের বিচার সাধারণ পাঠকের পক্ষে করা অসম্ভব। সুতরাং এ-কাব্যে টীকাকারের বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগের যথেষ্ট অবসর আছে। শুন্‌তে পাই, একখানি সটীক "অন্নদামঙ্গল" ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে টীকা যে কতদূর নির্ভরযোগ্য দুটি একটি কথার ব্যাখ্যা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও একটি বন্ধুর মুখে শুনেছি যে টীকাকার "কজল্‌বাস" শব্দের অর্থ করেছেন "কজ্জলবাস" অর্থাৎ যে কাজলের মত কালো কাপড় পরে। "কজল্‌বাস" অবশ্য সংস্কৃত নয় "যাবনী" শব্দ এবং ও-হচ্ছে একটি বিশেষ পাঠান জাতির নাম। তারপর টীকাকার "আলেমান" শব্দের অর্থ করেছেন "আক্কেলমান। "আলেমান" শব্দ অবশ্য ফার্সি নয় ফরাসী এবং ও হচ্ছে একটি বিশেষ ইউরোপীয় জাতির নাম, ইংরাজিতে যাদের বলে "জর্ম্মাণ"। "আলেমান" যে "আক্কেলমান" নয়, তার পরিচয় ত আজ পৃথিবীশুদ্ধ লোক পেয়েছে!

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চা থেকে তোমরা এই জ্ঞান লাভ কর্‌বে যে, বাঙলা-ভাষার মূল উপাদান এমন পদার্থ, যার সাহায্যে সাহিত্যের যা চরম বস্তু অর্থাৎ গীতিকাব্য ও কথাকাব্য—সে দু'ই সমান গড়া যায়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

একখানি ছোট্ট উপন্যাস।

—:০:—

নামটি হল তার বিজলী। কিন্তু বিধাতা তার যে দেহখানি গড়েছিলেন, তাতে বিদ্যুতের আভা আদৌ ছিল না। বরং সে অঙ্গে মিলিয়ে ছিল নিবিড় মেঘেরই তিমির ছায়া।

বিজলী ছিল একটি মুন্‌সেফের মেয়ে। মুন্‌সেফবাবুর দু'টি পক্ষ, প্রথমটি হল তাঁর কৃষ্ণপক্ষ, আর দ্বিতীয়টি শুক্লপক্ষ। মুন্‌সেফবাবুর বাপ কৌলীন্য বস্তুটিকে বড়ই সমিহ করতেন। তিনি যখন পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলেন, ভাবী পুত্র-বধূর রূপে তখনও তাঁর লক্ষ ভ্রষ্ট হয় নি। সে দিনও ক'নের বাপের কুলটা ছিল তাঁর বড়ই একটি আকর্ষণের বস্তু। আর মুন্‌সেফবাবু ছিলেন পিতৃ-ভক্ত সন্তান, তিনি পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে একটি কালো মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু যখন কালের একটি ক্ষুব্ধতরঙ্গ তাঁর বাপকে চোখের সুমুখ থেকে অনন্ত কোটি যোজন দূরে এক অজানা দেশে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, মুন্‌সেফবাবু তখন তাঁর পিতার ভ্রমটি সংশোধন করে নিতে আর কিছুমাত্র কালক্ষেপ করলেন না। তাঁর অন্তর-পুরুষটি এতদিন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে হাঁপিয়ে মরছিল। এবার যেন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাতে তাঁর ধড়ে নবীন প্রাণ ও নব-রসের সঞ্চার হল।

কৃষ্ণপক্ষ যে বিজলীকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেটা তার দেহের কৃষ্ণবর্ণেই ধরা পড়বার কথা। গোড়াতেই বৃহস্পতি হয়তো প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছিল; নতুবা বিজলীর এমন দুর্ভাগ্য যে, মুন্‌সেফবাবুর বড় গিন্নি, উমাতারা হল তার গর্ভধারিণী। বড় গিন্নির প্রতি মুন্‌সেফবাবুর যে কতটা অনুরাগ ছিল, এই একটি ঘটনা তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবে,—বড় বৌয়ের উমাতারা নামটি যেমন তেমনিই রয়ে গেছল। আর যদিচ মুন্‌সেফবাবু পৌরাণিক বিধি-বিধানের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখ্‌তেন, তাঁর ছোট বৌয়ের যোগমায়া নামটির পৌরাণিকত্ব কোন্ কালে ঘুচে গেছল। আদরের অত্যধিক চাপে সে নামটি ভেঙ্গে-চুরে নানা ঢংএ, নূতন নূতন ছাঁদে গড়ে উঠেছিল। কত রকম অভিব্যক্তি তার ঘটেছিল, যথা—মায়া, মায়ারাণী, রাণী ইত্যাদি।

জন্ম থেকেই বিজলী যে পাপের বোঝা বয়ে এনেছিল, তার গুরুভার আরো বাড়াবার জন্য গ্রহগণ হয়তো কুপিত হয়ে তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করেছিল। বিজলীর পিঠ পিঠ আরো দু'টি কন্যা-সন্তান যেন কোন গৃহ-দেবতার অভিশাপের মতোই এসে উমাতারার কোলটি জুড়ে নিয়েছিল। আর মায়ারাণী পূর্ব্বজন্মে যে সতী সাধ্বী রমণী ছিল, এইটে যেন প্রতিপন্ন করে তার আর জন্মের পুণ্যের জের, এজন্মে তার মাণিক-জোড়, দু'টি পুত্র-সন্তানে এসে ঠেকেছিল।

বড়গিন্নির বড় মেয়ে বিজলী যখন যৌবনের প্রথম ধাপে পা দেবে দেবে এমন হল, মুন্‌সেফবাবু ত ভেবে সারা হতে লাগ্‌লেন। মেয়ের প্রতি মুন্‌সেফবাবুর যে একান্ত প্রাণের দরদ ছিল, এটা অনুমান করবার বড় বেশি সঙ্গত হেতু অবশ্য ছিল না। কিন্তু মুন্‌সেফবাবুর মান-মর্য্যাদার ত একটা দাবী ছিল। একজন মুন্‌সেফ হয়ে তিনি ত পথের একটি

ভিখারী ধরে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না! কোন সৎ-পাত্রে যদি তিনি কন্যাকে সম্প্রদান না করেন, লোকে তবে বল্‌বে কি? এইরূপ নানা কারণে মুন্‌সেফবাবুর কালো মেয়েটি তাঁর বিষম একটি গলগ্রহ হয়েই উঠ্‌ল। বিজলীর রূপের আকর্ষণ ত আদৌ ছিল না। তারপর যথেষ্ট টাকা ছড়িয়ে বর-পক্ষকে যে প্রলুব্ধ কর্‌বেন, মুন্‌সেফ-বাবু তাতেও ছিলেন নারাজ।

উমাতারা কতকগুলো মেয়ে প্রসব করে মুন্‌সেফবাবুর সুখ-শান্তি হরণ করে তাঁকে বড়ই যে ভাবিয়ে তুলেছিল, এইটে উপলক্ষ্য করে মায়ারাণী বড়গিন্নিকে খোঁচা মার্‌তে কসুর কর্‌ত না। উমাতারার মুখে অবশ্য কোন জবাব ছিল না। সে বরং তার মেয়েদেরই গালিগালাজ কর্‌ত,—ছাইকপালী, আভাগী, পোড়ামুখী, তোরা আমার কাল হয়ে জন্মেছিস, তোদের জন্যই আমাকে বুকে নোড়ার ঘা মেরে আত্মহত্যা কর্‌তে হবে, ইত্যাদি। আর বিজলীর মনের ভিতর তখন যে কি রকম হত, সেটা বলা বড় শক্ত। সে থাক্‌ত চুপ করে। হয়তো তার প্রাণের বেদনা এমনভাবেই জমাট বেঁধে গেছল যে, কোন কথাটি আর বেরোবার পথ পাচ্ছিল না।

অমনতর বিপদের দিনে যেন একটি দেবতা এলেন, তাদের শাপ মুক্ত করতে। কুমারীশের জ্যেষ্ঠ সহোদর তখন যশোহরের একজন সব্‌-ডেপুটী কালেক্টর। একটি বড় বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে বাস কর্‌তেন, আর তার অপর অংশের ভাড়াটে ছিলেন মুন্‌সেফবাবু। কুমারীশ এম্‌, এ, পরীক্ষা দিয়ে কিছু দিনের জন্য যশোহরে এসে তার দাদার বাসাতে ছিল।

কুমারী স্নেহলতা এর কিছুদিন পূর্ব্বেই সনাতন হিন্দু-সমাজের

অটল প্রথার কঠিন নাগপাশে আত্ম-বলিদান দেয়। আর সেইটে উপলক্ষ্য করে দেশে তখন ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। যুবকদের প্রাণে একটি কর্ত্তব্য বোধ জাগিয়ে তোল্‌বার জন্য দেশের বক্তারা তাঁদের গলার আওয়াজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে আকাশের বুক বিদীর্ণ কর্‌ছিলেন; আর কাগজের সম্পাদক মহাশয়রা তাঁদের কলমের ডগাতে যেন ভাবের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। কুমারীশ আশৈশব কর্ত্তব্য পালনেই রত ছিল। পাঠশালার গুরুমহাশয়, ইস্কুলের শিক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক থেকে সুরু করে, যেখানে যার কাছে তার যতটুকু কর্ত্তব্য, সেটা ষোল আনা চুকিয়ে দেওয়াই তার জীবনের ছিল চরম লক্ষ্য। এহেন কর্ত্তব্যপরায়ণ কুমারীশের অন্তরে, সেই আন্দোলনের দিনেও কর্ত্তব্যের একটি সুমহান মূর্ত্তি দেখা দিয়েছিল, যার পুজো জোগাতে কুমারীশের সমগ্র মন সর্ব্বতোভাবেই প্রস্তুত ছিল। একটি উপলক্ষ্যও এবার জুটল।

কুমারীশ বাড়ীতে গিয়ে বৌদিদিকে চিঠি লিখ্‌লে, বিজলীকে সে বিয়ে কর্‌বে। এতে যদিচ সকলেই কিছু বিস্মিত হলেন, কোনরূপ আপত্তি করবারও কোন হেতু কারুর ছিল না। মুন্‌সেফ্‌বাবু আর সব্‌-ডেপুটী বাবু উভয়েই জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, এবং একই শ্রেণীর। আর দুটি ঘরও ছিল প্রায় সমতুল্য। যদি কুমারীশের মা জীবিত থাক্‌তেন, তিনি হয়তো তাঁর অমন পাশ-করা ছেলেকে একটি কালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে নারাজ হতেন; কিন্তু কুমারীশের মাও বেঁচে ছিলেন না।

একদিন এক শুভক্ষণে মুন্‌সেফবাবু কুমারীশের হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌লেন। বিজলীর এ সৌভাগ্যকে বাঙালী-ঘরের তরুণী-

মাত্রই হয়তো ঈর্ষ্যা করবেন। কিন্তু তার মনের খবরটা তাঁরা যদি একবার পান, তাহলে তাঁদের মনোভাবের হয়তো বিপর্য্যয় ঘটবে। ভাগ্যদেবতার যে দান আর দশজনে হয়তো তা পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে গ্রহণ করতেন, কিন্তু বিজলীর হাতে তার মর্য্যাদা যেন কতকটা ক্ষুণ্ণই হয়েছিল।

প্রথম পরিচয়েই বিজলী বুঝ্‌ল, কুমারীশ যে আপনা হতে সেধে এসে তাকে তার জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়েছে, প্রাণের দরদই এর মূল কারণ নয়।

কুমারীশের ভিতরের প্রাণটি শুকিয়ে কর্ত্তব্যের কঠিন-মূর্ত্তিই ধারণ করেছিল। নানা প্রসঙ্গে কুমারীশও এই কথাটিই বিজলীকে জানিয়ে দিল। অপ্সরীতুল্য কত সুন্দরী নারী তার মতো একটি সৎপাত্রের শ্রীকরকমলে সমর্পিত হলে আপনাদের জীবন ধন্য জ্ঞান কর্‌ত; কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে না পেরে, সে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়েছে। এমন দেবতুল্য যে স্বামী, দ্বৈতবাদীর পূজোর দেবতার মতো সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে তাকে পূজো করাই বেশ চলে; অদ্বৈতবাদীর জীবন-দেবতা হয়ে সে প্রাণের প্রীতিভরা শতদলটির উপর ভ্রমরের মতো এসে এক দণ্ডও বসে না। বিজলী তার পূজোর দেবতাকে পেল, কিন্তু প্রাণটি তার অনাদরেই পড়ে রইল। বিজলীর অন্তরের প্রতি অণু-পরমাণুকে স্পন্দিত করে রয়েছিল তার যে প্রাণের বেগ, সে যদি একটি প্রাণের পথ খোলা পেত, সৌদামিনীর মতো তা আলোক দানেই হয়তো নিঃশেষ হত; কিন্তু বদ্ধতার অন্তরে নিবিড় মেঘের স্তব্ধনীড়ে, ঝড়ের একটি প্রচণ্ড বেগের মতোই যেন তা লীন হয়ে রইল।

বিবাহের পর বহুদিন বিজলী তার স্বামীর পল্লি-ভবনেই বাস করেছিল। সে বাড়ীতে থাক্‌তেন কুমারীশের একটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে। বিজলীর হল তখন নদীর অবস্থা। নদী ধায় আপনার প্রেমাস্পদের উদ্দেশে। যদি তার উদ্দাম গতিবেগ প্রতিহত হয়, নদী তখন আপনার প্রাণের আবেগে দু'ধারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনদীগুলোকেই ভরে তোলে। বিজলী তার বড় জায়ের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে এম্‌নি আবেগের সঙ্গে ভালবাস্‌তে লাগ্‌ল, যেন তার ঐ ভালবাসাতেই আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে, সে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাক্‌তে চায়। গৃহকর্ম্মে যে বিজলীর মন না ছিল, তা নয়; কিন্তু যার জীবনের মুখ্য ধারাই হল প্রাণের প্রেমের ধারা, সংসারের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়গুলোর স্বার্থের বন্ধনে প্রাণটি তার কোনকালে কি বাঁধা পড়বে? গৃহকর্ম্মে বিজলীর যেটুকু আগ্রহ ছিল, তার চাইতে ঢের বেশি উৎসাহে বিজলী তার ভাশুর-কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর খেলাঘরের কাজকর্ম্ম কর্‌ত। আট বছরের বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী তার নতুন খুড়িমাকে বেশ একজন খেলার সঙ্গিনী পেয়েছিল।

জ্যোতিকে বিজলী বড় বেশি ভাল বাস্‌ত। একদণ্ড তাকে সে চোখের আড়াল হতে দিত না। আর জ্যোতিও খুড়িমার ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছিল। মেয়েটি যেন ছিল প্রাণেরই একটা ঢেউ। একদণ্ড সে স্থির হয়ে বস্‌তে পারত না। একমুহূর্ত্তও তার মুখটি বন্ধ থাকত না। একটি তরঙ্গের মতই জ্যোতি সদাসর্ব্বদা খল্‌খল্ করে নেচে-কুঁদে বেড়াত। হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, মুখের প্রতি শব্দটিকে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরে তুলে জ্যোতি যখন কথা

কইত, বিজলী একেবারে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌ত। কখন বা ছুটে গিয়ে জ্যোতিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বিজলী আবেগ-ভরে তার চোখে-মুখে চুম্বন বর্ষণ করত। আবার থেকে থেকে এক একদিন বিজলীর ভিতর প্রাণের জোয়ার এমন প্রবল হয়ে আস্‌ত, ক্ষুদ্র এক বালিকা তার বেগ আর সাম্‌লে নিতে পারত না।

রূপ-রাজ্যের কোন বিরহিণীর অন্তর-বেদনা, স্তব্ধরাত্রের মাঝি-মাল্লারা তাদের গানের সুরে যখন ভরে তুলে, আকাশের গায়ে ঢেলে দিত, আর সেই এক নারী-প্রাণের বিচ্ছেদ-বেদনা নিশীথ-প্রকৃতির তিমির-গড়া দেহখানি চুইয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে বিজলীর প্রাণের উপর এসে ঝরত, তখন জ্যোতিকে বিজলী যদিও তার বুকের ভিতর রাখত, স্বপ্নদ্রষ্টার মনের মতো প্রাণটি তার দেহের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে, কার যেন প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে ছুটাছুটি কর্‌ত—যার বস-বাস বিজলীর কল্পনার ত্রিসীমানার ভিতর কোথায়ও ছিল না। এক এক-দিন বিজলী তার শোবার ঘরের জান্‌লার গরাদে হাত দুখানি রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ত, সুমুখের বিস্তীর্ণ মাঠ জ্যোৎস্নাতে একেবারে ভরে গিয়েছে; আর প্রকৃতি তার সমগ্র আকাশ দিয়ে সেই উন্মুক্ত ক্ষেত্রের একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষকে বেষ্টন করে ধরে হাসি-ভরা মুখখানি নিয়ে তার উপর যেন ঝুঁকে পড়েছে। গাছের কচি কচি পাতাগুলো মন্দ মন্দ বাতাসে থর্ থর্ করে কাঁপছে, সে কাঁপুনি যেন প্রিয়জনের আলিঙ্গন-বদ্ধ কোন নারীরই প্রাণের শিহরণ। এ-দৃশ্যটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিজলী একেবারে আত্মহারা হয়ে যেত, কার যেন সন্ধানে তার প্রাণটি কোথায় নিরুদ্দেশ-যাত্রা কর্‌ত।

কুমারীশের শাস্ত্র মতে নারীর কর্ত্তব্য, পুরুষের ইচ্ছার বাহনটি হয়ে

পতির পদ-সেবা করা, এবং গৃহ-কার্য্যে বিশেষভাবে মন দেওয়া। বিজলীর সে কর্ত্তব্য-সাধনে কিছুমাত্র অমনোযোগ ছিল না। কিন্তু বিজলী যখন দেখ্‌ত, নদী-পারের তরু-শ্রেণীকে ছাড়িয়ে আরো দূরে—বহু দূরে, আকাশের একেবারে শেষ প্রান্তে মেঘের শ্যামল বক্ষে মাথা রেখে তিন চারটি তালগাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আরো ঊর্দ্ধে মেঘের শ্যামলতায় শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে, একটি বিহগ আর বিহঙ্গিণী মনের উল্লাসে এঁকে-বেঁকে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে; বিজলীর বদ্ধঘরে অর্গল-বদ্ধ প্রাণটি তখন আর স্থির থাক্‌ত না, কার যেন প্রত্যাশী হয়ে মুক্তির অবাধ আকাশে ছুটে যেতে চাইত। বিজলী তার প্রাণের বেগ সংযত করবার উদ্দেশ্যে হয়তো জ্যোতিকে তখন সুমুখে নিয়ে এক নতুন ঢং-এ তার চুলের খোপাটি বেঁধে দিতে বস্‌ত; অথবা তার ছোট ভাইটিকে কোলে করে তার মুখখানিতে অবিরাম চুম্বন বর্ষণ কর্‌ত।

এইত ফুরালো বিজলীর পল্লিজীবনের ইতিহাস। এবার সুরু হল তার জীবনের আর একটি ধারা। কুমারীশ তখন ডেপুটী কালেক্টরের পদে কার্য্য কর্‌ত। বিজলী স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থলে এল। সেখানে বিজলী হয়ে পড়্‌ল বড়ই একলা। কুমারীশের নিত্য সাহচর্য্য বিজলী সেখানে লাভ করেছিল, কিন্তু কুমারীশ ত আর ঝড়ের মতো একেবারে প্রাণের উপর এসে তার রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, আপনার বিহ্বলগীতি ভরে দিল না। সবিতা-দেবের মতো অন্তরের দূর আকাশে অবস্থান করে হৃদয়ের ভক্তি-রস নিঃশেষ করে শুষে নেওয়াই, স্ত্রীর প্রতি তার হল প্রধান কর্ত্তব্য। কুমারীশের বিশেষ উৎসাহ ছিল স্ত্রীর সেই কর্ত্তব্য পালনে। বিজলীর প্রাণটি সেখানে এক বিজনঘরে বদ্ধ হয়ে হাঁপিয়ে মর্‌বার মতই

হয়েছিল, এমন দিনে একদিকের একটি আকাশের পথ কিঞ্চিৎ যেন উন্মুক্ত হল। গুমট্-ধরা দিবসের স্তব্ধ তরুরাজির মতো বিজলীর যে প্রাণে স্পন্দনমাত্র ছিল না, তার শাখায় প্রশাখায় আবার যেন একটু বাতাস খেল্‌লে। একদল সঙ্গী বিজলীর সেখানে জুটল। তারা সকলেই ছিল শিশু। কর্ত্তব্যের তাড়না তাদের কারুর ছিল না। প্রাণের খেলাতেই তাদের ছিল অভিরুচি। বিজলী তাদেরই সঙ্গে ছেলেমানুষটি হয়ে সব রকমের ছেলেমানুষীর অভিনয়ে যোগ দিলে। টাকা-কড়িতে আসক্তি বিজলীর কোন কালেই ছিল না, টাকা হাতে পেলেই তার সঙ্গিনীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণে, অথবা পাঁচ রকমের উপাদেয় সামগ্রী নিজহাতে তৈরী করে তাদের খাওয়াতে, সে-টাকা সে নিঃশেষ করে দিত। আর তার হাত থেকে তার সঙ্গিনীরা যে দান গ্রহণ কর্‌ত, তার যথেষ্ট প্রতিদান বিজলী পেত, তার প্রাণে। বেগবতী স্রোতস্বিনীর একান্ত উদ্যম, যেদিকে তার প্রাণের গতি, সেই পথে তার যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে ঢেলে দেওয়াতে। বিজলীর ছিল নদীটির মতোই অদম্য প্রাণের বেগ, যে সঙ্গীরা তার প্রাণের পথ উন্মুক্ত করেছিল, তার যথাসর্ব্বস্ব তাদের বিলিয়ে দেওয়াতেই তার ছিল প্রাণের উল্লাস। আর বিজলীর কাছে তার সঙ্গীদের ত সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না। নেচে, গান গেয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, কত রকমের আব্‌দার অভিযোগ করে তারা বিজলীর প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্‌ত। তাদের কাউকে কাউকে বিজলী এতই ভালবাস্‌ত, সারাদিন অন্তে সাঁঝের আগে বিজলীর কাছে বিদায় নিয়ে তারা যখন বাড়ী যেত, সেই এক রাত্রের ব্যবধান যে কোন অসীমের নাগাল ধরত। আবেগে তার প্রাণটি যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠত। বিজলীর

প্রাণের উচ্ছ্বাস, অজস্র চুম্বন বর্ষণে সে যেন একেবারে ঢেলে দিত।

বিজলীর জীবনের ধারা হয়তো এম্‌নি ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে ভবিষ্যতের পথে আরো বহুদূর অগ্রসর হতে পার্‌ত, কিন্তু একটি ঘটনার চাপে তার জীবনের পাড় যেন একেবারে ভেঙ্গে এসে এক ঐরাবতের মত তার চল্‌বার পথ রোধ কর্‌ল। ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—কুমারীশ গিয়েছিল তার এজলাসে। বিজলী তার সঙ্গীদের প্রতীক্ষায়, একখানি মাসিক কাগজ হাতে করে বসে ছিল। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এসে তার পায়ের উপর একেবারে কেঁদে পড়লে। স্ত্রীলোকটির পরণের যে কাপড়, তাতে ছিল শত গ্রন্থি। আর শোক-তাপ-অনশন তার জীবন শেষের পথে তাকে যে অনুধাবন করেছিল, তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল তার কঙ্কালসার দেহ-খানিতে। স্ত্রীলোকটির একমাত্র পুত্র, তারও মৃত্যু হয়েছিল। থাক্‌বার মধ্যে তার ছিল, বিধবা পুত্রবধূ আর ক'টি নাতি-নাতনী। বড় নাতিটির বয়স উনিশ কি কুড়ি বছর, সে রেল-ইষ্টেশনে ন'টাকা বেতনের একটি কার্য্য কর্‌ত। ঐ ক'টি টাকাতে কোনক্রমে কায়ক্লেশে খেয়ে না-খেয়ে তারা সংসার চালাতো। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় পাড়ার এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের নতুন নতুন সাজসজ্জা দেখে ছোট ছোট ক'টি ভাই-বোন দাদার কাছে পূজোর কাপড়ের জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিলে। যুদ্ধ উপলক্ষ্যে এদিকে কাপড়ের বাজার ত একেবারে আগুন। তেমন চড়া দামে কাপড় কিনে পরবার সঙ্গতি তাদের আদৌ ছিল না। কিন্তু যারা শিশু, তাদের সে সদ্বিবেচনা কোথায়? দাদা দু'বেলা রেল-ইষ্টেশন থেকে যখন বাড়ী ফির্‌ত,

তার সাড়া পাওয়ামাত্র ক'টি ভাই-বোন পরম উল্লাসে ছুটে আস্‌ত; আর দাদার হাত দু'খানি যখন শূন্য দেখ্‌ত, মন বড়ই ক্ষুণ্ণ করে তারা সরে পড়ত। আজ নয় কাল, এ-বেলা নয় ও-বেলা,—এমনি করে অষ্টমীর দিন পর্য্যন্ত দাদা তার ভাই-বোনদের ভুলিয়ে রেখেছিল। সেই দিন সে একটি কাণ্ড করে বস্‌লে। রেল-ইষ্টেশনে যাবার পথেই এক ঘর তাঁতির বাস ছিল। ইষ্টেশনে যাবার সময়, এবং বাড়ী ফিরবার পথে সেই বাড়ীতে দাদার এক শিলেম করে তামাকের বরাদ্দ ছিল। ক'খানি কাপড়ের অভাবে ক'টি শিশু ভাই-ভগ্নির মনের দুঃখ একদিকে তার প্রাণে যেমন আঘাত কর্‌ছিল, অপর দিকে সেই তাঁতির বাড়ীতে স্তরে স্তরে কত রঙ্গীন তাঁতের কাপড় সে সাজানো দেখ্‌লে। সে তার প্রবৃত্তিকে আর দমন করে রাখতে পারলে না, সাঁঝের পর বাড়ী ফিরবার পথে সুযোগ দেখে ক'খানি কাপড় সে হস্তগত কর্‌লে। সারারাত তার মনের ভিতর ভারি ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চল্‌ল। পরদিন প্রত্যূষে তার কর্ম্মস্থলে যাবার পথে তাঁতি বুড়োর পায়ের উপর সে আবার কেঁদে পড়লে। তাঁতি বুড়ো, তাকে নিষ্কৃতি দেবে এই আশা দিয়ে, দশ জনের সমক্ষে তার স্বীকার উক্তিটি বের করে নিয়ে, তাকে পুলিশের হাতে হাওলা করে দিলে। সে হাজতে আবদ্ধ ছিল, কুমারীশের উপরই তার বিচারের ভার ন্যস্ত।

বড় নাতিটিই ছিল পরিবারের একমাত্র আশ্রয় স্থল, তার অভাবে বিধবা পুত্রবধূ আর তার ক'টি অপগণ্ড শিশু-সন্তানকে নিয়ে বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটির কষ্টের আর অবধি থাক্‌ত না। কুমারীশের উপর নাতির বিচারের ভার আছে জেনে, তার মুক্তির জন্য ঠাকুরমা বিজলীর কাছ এসেই কেঁদে পড়ল। আইন বিজলী বুঝত না, আর বোঝবার প্রবৃত্তিও

তার ছিল না। কিন্তু যে অপরাধীর অপরাধের মূলে ছিল তার প্রাণের একান্ত দরদ, বিজলীর কাছে তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। তারপর আবার অনুশোচনার পবিত্র সলিলে এবং সত্যবাদিতার বিমল বাতাসে সে অপরাধের পাপ ত কেটেই গেছল। স্ত্রীলোকটিকে বিজলী আশ্বাস দিল, তার নাতিটি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবে।

পরহিত-সাধন-ধর্ম্মের আলোকের স্পর্শে বিজলীর প্রাণ ভরে উঠেছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে একটি চিন্তা তার অন্তরের মাঝে উদয় হয়ে, তার প্রাণের আলো রাহুর মত গ্রাস কর্‌তে লাগ্‌ল। স্ত্রীলোকটিকে বিজলী আশা দিল, কিন্তু কিসের বলে? তার প্রাণের এজলাসে যার স্বপক্ষে রায় বেরোল, কুমারীশের কর্ত্তব্যবুদ্ধি তার প্রতিকূলে কি দাঁড়াতে পারে না? তাই যদি হয়, কুমারীশের কাছে কোনরূপ আব্দার যে করবে, সে অধিকার তার কোথায়? স্বামীই যার মুক্তির বিধাতা, তার কোন হিত কর্‌বে, এ ক্ষমতাটুকু বিজলীর নেই। যদি বিজলীর প্রীতি-ধারা কুমারীশের প্রাণের পথটি উন্মুক্ত পেত, তার কত অনুনয়-বিনয়, মান-অভিমান, হাসি-কান্না কুমারীশের হৃদয়-মন্দাকিনীতে তুফান তুলত। বিজলীর আব্দার শত সহস্রবার অন্যায় হোক, তবু কুমারীশের প্রাণের আসনটি যদি তার দখলে থাক্‌ত, তার কাছে বিজলীর কোনরূপ সঙ্কোচ হত না। যদি বা কোনক্ষেত্রে তার বিষবৎ প্রতিক্রিয়া হত, সে বিষের জ্বালা বিজলীকে সইতে হত না। তার প্রতি কুমারীশের ভালবাসা তারপক্ষে শিব হয়ে সে বিষ নিঃশেষে পান করত। কিন্তু প্রাণের পথ যে একেবারে রুদ্ধ। প্রাণের পরিচয়ে যে তার নিতান্ত পর, তার কাছে প্রাণের কোন প্রার্থনা যে নিবেদন করবে, এ হীনতাটুকু স্বীকার কর্‌তে বিজলীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়বার মতো

হল। যার প্রাণে আশার সঞ্চার করা হল, তার আশা-ভঙ্গের অপরাধ আশঙ্কায় বিজলীর অন্তর যদিচ বড়ই সঙ্কুচিত হল, তবু স্বামীর কাছে কোন কথাটি জানাতে বিজলীর প্রবৃত্তি হল না। আরো তার মনে এই খেদ জন্মালে, বিশ্বমানবের চোখে যে তার বড়ই আপন, তার প্রাণের নাগাল কোন দিনই সে পেল না। প্রাণের সম্বন্ধে যে তার এমনি পর, বাইরের পরিচয়ে তার যে সে কতদূর আপনার হয়ে আছে, এই চিন্তাটি আজ যেন বিজলীর অস্তিত্বের মূল পর্য্যন্ত ছেদন করতে উদ্যত হল। যে সঙ্গীদের চিন্তা বিজলীর মন থেকে মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর্হিত হত না, একটা ঝড়ের আবর্ত্তে তার অন্তরে তাদের প্রতিবিম্বও যেন আর পড়তে পাচ্ছিল না। সঙ্গিনীরা তখনও আস্‌ত কিন্তু বিজলীর কেমন একটি ভাবান্তর দেখে অধিকক্ষণ তার সাহচর্য্য তারা আর বাঞ্ছণীয় মনে করত না। আর বিজলীর কাছে বাইরের অস্তিত্বটা ত লোপ পেয়েছিল, তার প্রাণের ভিতরই লড়াইএর বিরাম ছিল না। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির আশা-ভঙ্গের অতি বিকট একটা করুণ ছবি বিভীষিকার মতো তার অন্তরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেখা দিয়ে তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলছিল। বিজলীর ঐ সন্ত্রস্তভাব দিন দিন আরো বাড়তে লাগল। অবশেষে বিচারের নির্দ্দিষ্ট তারিখে, একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে, বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ভিতরের প্রাণটিকে কিঞ্চিৎ যেন নুইয়ে এনে, বিজলী স্বামীর কাছে কোনক্রমে তার প্রাণের কথাটি ব্যক্ত করলে। কুমারীশ কোন কথাটি বললে না, নীরবে ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসলে। সে হাসির মর্ম্ম বুঝি এই, পনেরো বৎসরের কঠোর সাধনার ফলে যে পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা আমি লাভ করেছি, আর যে পদের কঠিন কর্ত্তব্য পালনে রত থেকে আমি তার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি,

সামান্য নারী হয়ে সে পদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কোন্ সাহসে তুমি নির্দ্ধারণ করতে চাও? যে পৃথিবীর দিক্‌চক্ররেখা ঘরকন্নার সীমা অতিক্রম করেনি, সেই হল তোমার পৃথিবী; তার বাইরে দৃষ্টি দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়।

হাসির এই মর্ম্ম বিজলী ঠিক প্রণিধান করতে পারুক বা না পারুক, সে হাসির তূণে যে শর ছিল তার প্রাণের ভিতর গিয়ে তা বিঁধ্‌ল। বিজলীর মনের অস্থিরতা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেড়েই চলছিল, তার এমন অবস্থায় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি এসে তার পায়ের উপর যেন একেবারে টাল্ খেয়ে পড়লে। কুমারীশ তার নাতিটির উপর ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল।

যার অপরাধ বিজলী দণ্ডযোগ্যই মনে করেনি, তার যে আবার এতদূর কঠিন সাজা হতে পারে, এমন ধারণা যে বিজলীর কল্পনা-তেও স্থান পাবার অযোগ্য। বিজলীর মনে হল, তাকেই যেন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কুমারীশ তার উপর এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেছে। বিজলীর সর্ব্বাঙ্গের শিরা উপশিরায় বিদ্রোহের বহ্নি যেন জ্বলে উঠ্‌ল। যদি সেই দণ্ডেই কুমারীশের হুকুম বাতিল করে তার আসামীকে মুক্তি দেবার কোন উপায় উদ্ভাবন হত, বিজলী তার জীবন পণ করে সেই কার্য্যই সমাধা করত। বিজলীর দেহের প্রতি অণু-পরমাণু আজ কুমারীশের শাসন উল্টিয়ে দিয়ে তার বিপক্ষতা সাধন করতে যেন চায়। কুমারীশের ঘর-বাড়ীতে, অশোকবনের সীতাদেবীর মতো বিজলীর আজ তাই হল বন্দিনীরই অবস্থা। তার নিজের অবস্থাই যেখানে এতদূর নিঃসহায়, যে স্ত্রীলোকটি তার পায়ের তলায় পড়ে মাথা ভাঙ্গতে লাগ্‌ল, তার সেখানে সে কোন্ হিত সাধন করবে?

বিজলীর কাছে টাকা সেদিন ছিল, কিন্তু যে সূত্রে সে টাকার উপর তার অধিকার জন্মিবার কথা, সে অধিকার সূত্র ছিন্ন কর্‌বার অভিলাষই যখন তার প্রাণে একান্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে টাকা দান বা গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিকে বিজলী চৌর্য্যবৃত্তির মতো জঘন্য জ্ঞান কর্‌লে। বিজলীর সেখানে একমাত্র নিজ সামগ্রী ছিল, তার গলার একটি হার। সে হারটি তার বিবাহের দান-যৌতুকের তালিকাভুক্ত নয়। মায়ের মৃত্যুকালে বিজলী তার মায়ের হাত হতে সেই হারটি তাঁর শেষ দান গ্রহণ করেছিল। আজ একটি দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে বিজলী তার গলার হারটি খুলে স্ত্রীলোকটিকে দান কর্‌লে।

আর বিজলীর প্রাণের উপর অবজ্ঞা-অনাদরের তুষারপাতে তার বুকের রক্ত যখন হিম হয়ে এসেছে, তখন যে মৃত্যুর দূত বারবার এসে বিজলীকে অতি সঙ্গোপনে তার প্রেমবার্ত্তা জানিয়ে গেছল, আজ সাগরের পার হতে সেই মৃত্যুর রথ এল বন্দিনীকে উদ্ধার কর্‌তে।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

বাঙলা ভাষার কুলজী। *

—:*:—

ভাষাতত্ত্বের কোন্ অঙ্গ নিয়ে' আপনাদের সুমুখে কিছু নিবেদন ক'রবো তা আমি ঠিক ক'র্‌তে পারি নি। ভাষাতত্ত্ব আর তার শাখা উচ্চারণতত্ত্ব—এই দুটো নোতুন ‡ বিদ্যার মোহে প'ড়ে গিয়ে'ছি—সবে মাত্র এই বিদ্যার আস্বাদ পেয়ে'ছি, আগ্রহের সঙ্গে কিছু কিছু পড়্‌ছি, শিখ্‌ছি, আপনাদের কিছু নোতুন কথা শোনাবো এমন যোগ্যতা এখন আমার হয় নি। এই বিদ্যাটাকে নোতুন ব'লেছি, কিন্তু এটা বিশেষ ক'রে আমাদের দেশেরই বিদ্যা—তাহ'লেও অনেক দিন ধ'রে আমাদের দেশে, বাঙলায়, এর চর্চ্চা নেই—ইউরোপ থেকে ফের একে নোতুন ক'রে আমদানী ক'র্‌তে হ'য়েছে। পাণিনি, প্রাচীন শিক্ষাকার আর সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরা আমাদের নমস্য; সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চ্চায় এই গুরুদের ছাড়লে চ'ল্‌বে না—কিন্তু আমরা এখন যে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যা শিখ্‌বো, যে উচ্চারণতত্ত্ব বা শিক্ষাশাস্ত্র প'ড়বো সেটি হচ্ছে একটা মস্ত ব্যাপক জিনিস; কেবল ভাষাশিক্ষা আর শুদ্ধভাবে শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারণ করানো তার উদ্দেশ্য নয়—সেটি

---

* কৃষ্ণনগর নদীয়া-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

‡ এই বানান দেখে' কেউ চ'ট্‌বেন না—কথাটা পুরানো বাঙলায় আর হিন্দীতে 'নোতুন', সংস্কৃতের 'নবতন'। আমরা 'নোতুন' বলি, কিন্তু লেখ্‌বার বেলায় 'নূতন' লিখে' একটি পণ্ডিতী ধৃষ্টতা করি।

একাধারে মানব-ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ধ্বনিতত্ত্ব। এই বিদ্যা পশ্চিমের কাছ থেকে নোতুন যুগের এক দান হিসাবে আমাদের কাছে উপস্থিত; সমস্ত জীবন ধ'রে এর সাধনা ক'রতে পারা যায়; এর সাধনায় মানবমাত্রই অধিকারী, এর সাহায্যে অনেক বিষয়ের মোহ কাটিয়ে' উঠতে পারা যায়, এই বিদ্যা ভাষার ভিতর দিয়ে' প্রাচীনের যথার্থ স্বরূপটি দেখিয়ে' দেয়। ভাষা মানবের বিশেষ গৌরব; আধুনিক জগতে জাতি ও সভ্যতা অর্থে ধর্ম্ম নয়, কৌলিক উৎপত্তি নয়, গণ-মণ্ডলী নয়, জাতি ও সভ্যতা অর্থে ভাষা। আমরা বাঙালী—আমাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, আর্য্য আছে, দ্রাবিড় আছে, কোল মোঙ্গোল আছে, ফিরিঙ্গী আছে—কিন্তু আমাদের জাতীয়তার সূত্র হচ্ছে আমাদের বাঙলা-ভাষা। এই ভাষার জাত ঠিক হ'লে, এর পিতৃকুল মাতৃকুলের সমস্ত খবর জানা গেলে, বাঙালী জাতির বাঙালীর ধর্ম্মের সভ্যতার সমাজের সমস্ত লুকানো কথা বেরিয়ে' প'ড়বে। আমার ঘরের কথা, অথচ এত লুকানো, এত রহস্যময় হ'য়ে র'য়েছে! ভাষাতত্ত্বের প্রদীপ এই রহস্যের অন্ধকার দূর করবার জন্য তৈরী র'য়েছে। লোকে এই বিদ্যাকে বিশেষ নীরস ব'লে মনে করে—সাধারণ লোককে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না—কারণ এটি প্রথমত শুষ্ক বিশ্লেষণের কাজ—প্রতিপদে একে মাটি ছুঁয়ে' যেতে' হয়। এতে কল্পনার হাওয়ায় উড়ে' বেড়াবার পথ নেই—নানান্ সূত্র একসঙ্গে ধ'রে থাকতে হয়। এই বিদ্যায় মনের উপর যে ধকল পড়ে তা সকলে বরদাস্ত ক'রতে পারে না। কিন্তু এর থেকে বার করবার জিনিস এত র'য়েছে—যথানিয়ম কাজ ক'রে গেলে এত নোতুন ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে যে, যাঁরা এর আস্বাদ পে'য়েছেন, তাঁরা পরিশ্রমকে পরিশ্রমই মনে

করেন না, এর চর্চ্চায় এক অপূর্ব্ব আনন্দ পান। ইউরোপের লোকেরা তাঁদের ভাষায় কিছুই গুপ্ত অজ্ঞাত থাকতে দেন নি,—ইংরিজি, ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতিতে যা কাজ হ'য়েছে, তার শতাংশের এক অংশও আমাদের দেশ-ভাষাগুলিতে হয় নি। অথচ আমাদের দেশের ভাষাগত সমস্যাগুলি আরও জটিল। জমি বিস্তর প'ড়ে র'য়েছে, আবাদ করবার লোক চাই। যাঁরা এদেশের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজ ক'রছেন, তাঁদের মধ্যে দেশী লোক খুবই কম। বাঙলা-ভাষার কথা যাঁরা আধুনিক রীতিতে আলোচনা ক'রছেন, এক আঙুলে গুণে' তাঁদের সংখ্যা শেষ ক'রতে হয়। কিন্তু এ সব কাজে ডাকাডাকি ক'রে লোক সংগ্রহ ক'রতে পারা যায় না—যে মনে মনে এর টান অনুভব করে সেই লে'গে যায় আর সে-ই বেশী কাজ করে। কিন্তু তবুও কার মনে কোথায় এ বিদ্যার দিকে একটু প্রবণতা প্রচ্ছন্ন র'য়েছে, সেটা চাপা পড়বার পূর্ব্বেই জীইয়ে' রাখবার চেষ্টা করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে ফল হ'তে পারে। সেটি করবার একমাত্র উপায়,—গোড়া থেকেই এই বিদ্যার সঙ্গে একটু পরিচয়—যাতে জান্‌বার শোন্‌বার শেখ্‌বার আগ্রহ জে'গে ওঠে। অর্থাৎ বাঙালীর ছেলে যখন ইস্কুলের উঁচু শ্রেণীতে পড়ে, তখন বাঙলা-ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা জ্ঞান তার পাওয়া উচিত। এটা ক'রতে পারলে এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে কাজ করবার জন্য রিক্রুট পাওয়া সহজ হয়—আর দেশের মধ্যে নিজের ঘরের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধিরও সহায়তা হয়। আপনাকে না জানলে অপরকে জানবার ক্ষমতা জন্মে না।

ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ করে ভারতবর্ষের আর্য্যভাষাগুলির ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ক'রতে ক'রতে দেখি যে, আমাদের অনেক পূর্ব্ব-সংস্কার আ

বিশ্বাস ঘা খায়। সকল পুরানো জাতির বংশধর বা সভ্যতার উত্তরাধিকারী নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে একটা স্পর্দ্ধা রাখে। ইটালীর লোকেরা মনে করে, তারা বিশ্ববিজয়ী রোমানদের সন্তান; গ্রীসের লোকেদের বিশ্বাস যে তারা লেওনিদাস সোক্রাতেস-এর জাতি,—তারা যে স্লাভ বংশের লোক, গ্রীসে এসে' গ্রীক জাতির ভাষা আর সভ্যতা নিয়ে'ছে সে কথাটা ব'ললেই তারা চ'টে যায়। সব জায়গায় দেখা যায় যে, নিজের জাতি সম্বন্ধে একটা না একটা সংস্কার জাগ্রত র'য়েছে। সত্যের অনুসন্ধান ক'রতে হ'লে এসকল সংস্কারের উপরে উঠতে হ'বে। কুক্ষণে এদেশে বিলেত থেকে নোতুন ক'রে 'আর্য্য' শব্দের আমদানী হ'য়েছিল; মাক্সমূলারের লেখা প'ড়ে, আর নব্য হিন্দুয়ানীর দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদ্‌হজমের ফলে, একটা নোতুন গোঁড়ামি এসে' আমাদের ঘাড়ে চে'পেছে, সেটার নাম হচ্ছে "আর্য্যামি"। এই গোঁড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি ধ'রেছে—স্বাধীন চিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না ক'র্‌লে ইতিহাস চর্চ্চা বা ভাষতত্ত্বের আলোচনা—কোনটারই পথ নিরাপদ হয় না। এই গোঁড়ামির মূলসূত্র হচ্ছে এই—

১। যা-কিছু ভাল তা প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে ছিল (অথচ এই আর্য্য যে কারা, সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান কারুর নেই—একটা আব্‌ছা আব্‌ছা রকমের ধারণা আছে যে মুসলমানদের আসবার পূর্ব্বের কালের হিন্দুরাই আর্য্য)। ২। অতএব যা-কিছু খারাপ, সমস্তই আর্য্যেতর—'অনার্য্য'। সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য শব্দের যে মানে, ইংরিজি Aryan-এর মানে ঠিক তা নয়; non-Aryan-এর অর্থ সংস্কৃতের 'অনার্য্য' দাঁড়-করানোতে যত কিছু বিভ্রাট ঘ'টেছে। ৩। প্রাচীন হিন্দুরা

আর্য্য, আমরা হিন্দু, এঁদের বংশধর; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনার্য্য কিছুই নেই। যদি বা কিছু থাকে—সে-সব কথা তোলা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে অনধিকারী ঐতিহাসিকের অন্ত নেই। এঁদের সকলেই এই তিন বিশ্বাসের খোঁটায় আপনাদের বেঁধে' মনের আনন্দে চোখ বুজে' ঘুরপাক খাচ্ছেন—মনে ক'রছেন, ঐতিহাসিক গবেষণা ক'রছি। ভাষাতত্ত্বেও উৎকট আর্য্যামি বিদ্যমান। তবে সৌভাগ্যের বিষয় সেটা আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছে। প্রাকৃতকে এখন অনেকে মানছেন। বাঙলা-ভাষাটা যে অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা, সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মানবে; কিন্তু আর্য্যামি যতদিন বাধা দিতে থাকবে ততদিন বাঙলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে।

কথাটা একটু খুলে' বলা যাক্। বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য্য জাতি—মোঙ্গোল কোল মোখের দ্রাবিড় এই সব মিলে' সৃষ্ট খিচুড়ী, যাতে আর্য্যত্বের গরম-মশলাটুকু উপরে প'ড়েছে মাত্র। একথাটা স্বীকার ক'র্‌তে যেন কেমন লাগে। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নাকি শত-করা ১৩ জন মাত্র; যাঁরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির, তাঁদের মধ্যে দু'চার জন বড় গলায় "বাঙালী অনার্য্য" এ কথাটা বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁরা মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ, অতএব আর্য্যত্বের গরম মশলার একটা কণা, অনার্য্য ঢাল-ডাল ন'ন। আমি নিজে ব্রাহ্মণ বংশীয়; কিন্তু আমার বিশ্বাস, গরম মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে। প্রচ্ছন্ন আর্য্যামিটুকুর হাতথেকে অনেকেই একেবার মুক্ত হ'তে পারেন না। Scientific disinterestedness যাকে বলে, সেটা বড় দুর্লভ। জাতের পাঁতি নিয়ে আলোচনা ক'রে আপাতত ঝগড়া তোলবার ইচ্ছে নেই, তবে ভাষা-

তত্ত্বের দিক দিয়ে' এইটুকু বলা যায় যে, বেদের সময়থেকেই আর্য্যভাষা অনার্য্যের ঘরে জাত দিয়ে'ছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে' শুদ্ধ ক'রে জাতে তোলা যায় না। আদি কালের আর্য্যজাতি উত্তর মেরুতেই থাকুন আর মধ্য এশিয়ায় থাকুন, দক্ষিণ রুষেই থাকুন আর স্কাণ্ডিনেভিয়াতেই থাকুন, বা এদেশের লোকই হ'ন, তাঁদের নিদর্শন কোথাও মেলে না; কিন্তু তাঁদের ভাষা আর চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে, আর তাই অবলম্বন ক'রে তাঁদের সভ্যতা ও রীতনীতি সম্বন্ধে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যা অনেক খবর দিয়ে'ছে। দেখা যায় যে, বেদে যে ভাষার নিদর্শন আমরা পাই, কেবল সেটাতেই অনেকটা মূল আর্য্যত্বের ছাঁচ বর্ত্তমান; তার পরের অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কৃতে, প্রাকৃতে আর আধুনিক ভাষাগুলিতে সে ধাঁচা নাই—পুরানো ধাতু আর শব্দ অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু কোথাথেকে অনেক নোতুন শব্দ এসে' জুটে'ছে, বাক্য-রচনা-রীতি আর পুরানো বা বিশুদ্ধ আর্য্যচিন্তার অনুরূপ নয়, অন্য ধরণের। একদিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষা—আর একদিকে বাঙলা প্রভৃতি; এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায় যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাঙলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাঙলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যত তদ্ভব, অর্থাৎ বৈদিকথেকে উৎপন্ন। বৈদিক ক্রমে প্রাকৃত হ'ল,—প্রাকৃত বাঙলা প্রভৃতিতে দাঁড়াল। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু একটানা ভাবে হয় নি। বাঙলা প্রভৃতির উৎপত্তি আর প্রকৃতি বিচার ক'রলে এইটুকু বোঝা যায় যে, বৈদিক কালের 'জাত্' আর্য্যভাষীর বংশধরের মুখে মুখে বদ্‌লে' এলে' যে রকমটি এর রূপ দাঁড়াত, এর এখনকার রূপটি সে রকম নয়। আর্য্যভাষা অন্-আর্য্য-ভাষীর দ্বারা গৃহীত হওয়াতেই এর পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হয় নি।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। খ্রীষ্টীয় পাঁচের শতে ইংরিজিভাষী টিউটনেরা ব্রিটেনে বাস ক'র্‌তে আরম্ভ করে—ব্রিটেন-দ্বীপে ইংলাণ্ডে আর দক্ষিণ-স্কট্‌লাণ্ডে ছড়িয়ে' গিয়ে' এরা নিজেদের জাতির আর ভাষার প্রসার করে। ইংলাণ্ডে আর দক্ষিণ-স্কট্‌লাণ্ডে লোকেদের পূর্ব্বপুরুষ মূলত ইংরিজি-ভাষী, এদের মুখে ইংরিজির পরিবর্ত্তন একরকম নিয়মে হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইংলাণ্ড আর স্কট্‌লাণ্ড থেকে ইংরিজি-ভাষী লোকেরা আয়র্লাণ্ডে অল্প অল্প ক'রে উপনিবেশ ক'র্‌তে থাকে; রাজশক্তির প্রভাবে আয়র্লাণ্ডের অধিবাসী লোকেরা ক্রমে ক্রমে ইংরিজি গ্রহণ ক'র্‌তে থাকে। আইরীশ লোকেরা আগে কেল্‌টিক্ ভাষা ব'লত; এখন এরা প্রায় সকলেই ইংরিজি বলে। এখানে দেখছি যে একটা বিদেশী ভাষা অন্য জাতের উপর চ'ড়ে ব'সল; সে জাতের পুরানো ভাষার অনেক ধাঁজ আর ঢঙ, অনেক রীতি নীতি, শব্দ, বিশেষত্ব, তাদের নোতুন-ক'রে নেওয়া ভাষায়ও এসে' গেল। আয়র্লাণ্ডে ইংরিজি ভাষার যে রূপ, সেটা হচ্ছে বিদেশীর মুখের ইংরিজির রূপ 'জাত্' ইংরিজি-ভাষীর মুখের রূপ সেটি নয়। ভারতে আর্য্য ভাষার সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাও খাটে। "আর্য্যীকৃত" দ্রাবিড়, কোল ও মিশ্র জাতিদের মুখে আর্য্যভাষা আপনার স্বরূপ বজায় রাখতে পারল না। আর্য্যভাষার মালমশলা, পুরানো দেহটা—রইল বটে, কিন্তু তার চেহারা বদ্‌লে' গেল।

ভাষায় যা দেখা যায়, ভারতবর্ষের ধর্ম্মের আর সভ্যতার ইতিহাসেও তা দেখা যায়। আকাশের দেবতার উপাসক বৈদিক বা বৈদিক-পূর্ব্ব যুগের আর্য্য একদিকে—আর একদিকে পৃথিবীর দেবতার উপাসক দ্রাবিড়; আর্য্য আর দ্রাবিড় সভ্যতা আর চিন্তা মিলিয়ে'ই

হিন্দু সভ্যতা আর চিন্তা। আর্য্যভাষা দ্রাবিড়ের ও অন্য অন্-আর্য্যের মুখে বদ্‌লে'ই প্রাকৃত ; আর অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে ধ্বনি-গত পার্থক্য থাকলেও উভয় ভাষা একই জাতির চিন্তার ফল। একথা তাদের বাক্যরীতির সাম্যে দেখা যায়। আমরা আর্য্যভাষা বলি, কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য্য ধরণে আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে। Syntax-এ বৈদিক একদিকে, প্রাকৃতগুলি, আধুনিক ভাষাগুলি আর দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর একদিকে। অন্-আর্য্য ভাষীর মুখে না প'ড়লে আর্য্যধ্বনিগুলির ভারতে যে গতি দাঁড়িয়ে'ছে সে গতি হ'ত না।

ভাষা ব'ললে বুঝি, মানুষের কণ্ঠের স্বরের ধ্বনি মিলিয়ে' শব্দ সৃষ্টি ক'রে তার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ। দুটো জিনিস এতে আছে—একটার স্থিতি শারীরিক যন্ত্রের উপর—সেটা হচ্ছে ধ্বনি, আর একটির উৎপত্তি চিন্তা থেকে—ভাব। বাক্য—অর্থ, পরস্পর জড়িত। আদিম কালে যখন মানুষ প্রথম ভাষা প্রয়োগ করে, তখন শারীরিক অবস্থার বাহ্য প্রকাশ হ'ত ব্যক্ত ধ্বনি দিয়ে' ; যেমন ইতর জীবেদের মধ্যে এখনও দেখা যায়। তারপর যখন মানুষ চিন্তা ক'রতে শিখলে, তখন এই সকল ধ্বনি মিলিয়ে' ধাতু বা মূল শব্দ হ'ল, সেই শব্দগুলি এক একটি ভাবের মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়াল। পরে মনের চিন্তার অনুবর্ত্তী হ'য়ে সেই শব্দগুলি বাক্যে' sentence-এ সংযুক্ত হ'ল। দেখা যায় যে, ধ্বনিগুলো বদ্‌লাতে পারে, তাদের সমষ্টি ধাতু শব্দগুলো আর প্রত্যয়গুলোও বদ্‌লায় ; কিন্তু কোনও জাতের মধ্যে তার চিন্তাপ্রণালীটি সহজে বদ্‌লায় না—কারণ সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কের জিনিস, ধ্বনি বা শব্দের মত সহজে অনুকরণীয় নয়। অন্য জাতির প্রভাবে প'ড়ে এক জাতি নোতুন ধ্বনি, শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় শিখে'ছে, আত্মসাৎ ক'রেছে, কিন্তু

যেরূপ চিন্তায় তারা অভ্যস্ত, সেরূপ ভাবে চিন্তা-করা-টা শীঘ্র ছাড়তে পারে না—সাধারণত তাঁদের নোতুন-করে-শেখা অন্য জাতির ভাষার শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় তারা নিজ ভাষার বাক্য রচনার অনুরূপ ক'রে নেয়। অর্থাৎ syntax-টি বিশেষ প্রবল থাকে, এটাই জাতি-বিশেষের মানসিক প্রবণতার বিশেষ চিহ্ন। ভারতে আর্য্যভাষার গতি ধরা যাক্। বৈদিক-পূর্ব্ব ভাষার উচ্চারণের, ধ্বনি-সমষ্টির যা বিশেষত্ব, ভারতে দ্রাবিড়ের সঙ্ঘাতে এসে' অনেকটা বদ্‌লে' গিয়েছে। প্রথম—বৈদিক-পূর্ব্ব ভাষায় কতকগুলি উষ্ম ধ্বনি ছিল, সেগুলি বৈদিকে মেলে না ; আবার এটাও দেখি যে, দ্রাবিড়ে উষ্ম ধ্বনির একান্ত অভাব। তারপর, আদি আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ছিল না ; এখন মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি হচ্ছে বিশেষ ক'রে দ্রাবিড় ভাষার ধ্বনি, সেগুলি অন্য প্রাচীন ভাষায় মেলে না। যত এদিকে আসি, ততই দেখি ভারতের আর্য্য-ভাষায় মূর্দ্ধণ্যের বৃদ্ধি হ'তে চ'ল্‌ছে। এটি একটা লক্ষ্য করবার জিনিস।

দ্রাবিড় আর কোল উচ্চারণের বিশেষত্ব—কথার গোড়ায় দুই ব্যঞ্জন একত্র থাকতে পারে না ; হয় তাদের ভেঙে' নেওয়া হয়, নয় একটিকে লোপ করা হয়। প্রাকৃতেও তাই, আমাদের ভাষাতেও তাই। অথচ ও-দিকে ইউরোপে দেখি, কথার গোড়ার সংযুক্ত ব্যঞ্জনের কোনও হানি হয় নি। ঈরানের ভাষায়, আফ্‌গান্‌দের ভাষায়, কাফিরদের ভাষায় দেখি, এখনও সংযুক্ত বর্ণ কথার আদিতে জোরের সঙ্গে চ'লছে। বৈদিকে কত রকমারি tense বা ক্রিয়ার কালবাচক রূপ। সংস্কৃতে সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বজায় আছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতে, প্রাচীন ভারতের জনসাধারণের

ভাষায়, সাধারণত তিনটিতে ঠেকে'ছে। প্রাচীন দ্রাবিড়ে মোট দুটি কালবাচক রূপ ছিল, পরে আর কতকগুলির উদ্ভব হয়। ও-দিকে গ্রীসে রোমে কিন্তু প্রাচীন কালবাচক রূপের বিশেষ হানি হয় নি। দ্রাবিড়ে, কোলে আর ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় prefix-এর হাঙ্গামা নেই, সবই suffix, আমাদের ভাষাগুলিতে তাই, কিন্তু বৈদিকে তা নয়। বৈদিকে preposition ছিল, সেগুলি সংস্কৃতে ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত উপসর্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে'ছে। ত-তবৎ প্রত্যয় দিয়ে' তিঙন্ত ক্রিয়ার কাজ সারা ত সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে সাধারণ। যেমন সঃ গতঃ, অশ্বম্ আরূঢ়বান্। দ্রাবিড়েও ঠিক সেইটি দেখি। বৈদিকে তা নয়—স জগাম, অশ্বম্ অরুক্ষাৎ। বাঙলার যে অতীত আর ভবিষ্যতের প্রত্যয়, তা এই 'ত' আর 'তব্য' থেকে হ'য়েছে, কোনও বৈদিক তিঙ্ থেকে নয়। এ ছাড়া, অনেক বাঙলা idiom-এ দ্রাবিড়ের ছাপ পাওয়া যায়। বাঙলায় অসমাপিকা-ক্রিয়ার ঘটা, সহায়ক-ক্রিয়ার ব্যবহার প্রভৃতি আর নানা চলতি বাক্য-রীতি দ্রাবিড় ভাষার অনুযায়ী।

দ্রাবিড় শব্দ আধুনিক বাঙলায় অনেক আছে, আর সেগুলি একেবারে ঘরোয়া শব্দ, যা লোকে বই প'ড়ে শেখে না, যা পরিবারে ধারাবাহিকরূপে চ'লে আসে। সংস্কৃতেও বিস্তর দ্রাবিড় শব্দ আছে। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হ'য়ে গে'ছে। Kittel-এর কন্নাড়ী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় প্রায় ৪৫০ সাধারণ সংস্কৃত শব্দ দেওয়া আছে, যেগুলি দ্রাবিড় থেকে নেওয়া। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বাঙলা ভাষায় অনেক দ্রাবিড় কথা বের ক'রেছেন।

এই সকল বিষয় বেশী উদাহরণ দিয়ে' বোঝাতে গেলে, পুঁথি বেড়ে যায়।

আমার ধারণা এই—খালি সংস্কৃত আর প্রাকৃতের দিকে নজর রাখলে চ'লবে না, বাঙলা ভাষার ইতিহাস ঠিক ক'রে জানতে গেলে অন্-আর্য্য ভাষাগুলির দিকেও নজর রাখতে হবে। আর এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রতে গেলে শিক্ষার দরকার, সাধনার দরকার—ঘরে ব'সে খোযখেয়ালী গবেষণায় চ'লবে না। আমাদের মাল-মশলা সমস্ত হাতের কাছে নেই। মাটি খুঁড়ে' পাথর কাঠ কেটে' আনবার সময় এখন। সব ঠিক হ'লে তবে ইমারত উঠবে। একজনকে সব দিককার উপাদান জোগাড় ক'রতে গেলে চ'লবে না—এক একটা বিষয় এক একজনকে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ—এটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎসাহী লোকেদের যোগাড় ক'রে দিতে হবে। এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ এগিয়ে'ছে—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়—কিন্তু ঢের বাকী। ছাত্রদের দ্বারায় এরূপ অনেক কাজ হ'তে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ—technical terms—সেগুলির আলোচনায় অনেক নোতুন খবর বেরুতে পারে, এটার সম্বন্ধে অনেকেই নিজের নিজের প্রদেশের ভার নিতে পারেন। যাঁদের বাঙলার প্রান্ত জেলায় বাস—যেখানে অন্-আর্য্যভাষী জাতি এখনও বিদ্যমান, তাঁদের উচিত সেই প্রান্তের অন্-আর্য্য ভাষা শিখে' নেওয়া। সাঁওতালী আর কাছাড়ীর প্রভাব যে পশ্চিম বাঙলার আর উত্তর বাঙলার ভাষায় আছে তা সহজেই অনুমান ক'রতে পারা যায়; কারণ রাঢ়ের জন-সাধারণ—masses এর মধ্যে কোল-জাতির উপাদান আছে, উত্তর-বঙ্গ আর কামরূপের লোকেরা ত সেদিন পর্য্যন্ত কাছাড়ী বা বড ভাষা ব'লত, এখন বাঙলা-ভাষী হচ্ছে, মুসলমান আর হিন্দু হ'য়েছে,

এমন কি অনেকে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এ কাজ ততটা সহজ নয়। বাঙলা-ভাষা যখন জন্মগ্রহণ করে, তখনকার দিনের অনার্য্য-ভাষার প্রভাবটাই বেশী প'ড়েছিল। কিন্তু অনেক অনার্য্য-ভাষা লোপ হ'য়েছে, আর অনেকের পূর্ব্ব স্বরূপটি জানবার উপায় নেই। তবুও, এদিক দিয়ে' কিছুই জানবার চেষ্টা হয় নি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় বাঙলার পশ্চিম প্রান্তের অন্-আর্য্য জাতদের ভাষা, ইতিহাস, রীতি নীতি আলোচনা ক'রছেন; তাঁর মত আরও কর্ম্মী দরকার, যাঁরা এই সকল অন্-আর্য্যদের সঙ্গে তাদের আশ্‌পাশের হিন্দু বাঙালীদের সম্বন্ধ কি, নৃ-তত্ত্ব-বিদ্যার দিক থেকে সেটা চর্চ্চা ক'রবেন। বাঙলা দেশের প্রত্যেক জেলার মহকুমা থানা নির্ব্বিশেষে গ্রাম ও ভূসংস্থানের নামের তালিকা সংগ্রহ হওয়া উচিত, এমন সকল নামের তালিকা, যেগুলির মানে বোঝা যায় না, আর সংস্কৃত বা বাঙলার সাহায্যে, ব্যাখ্যা ক'রতে পারা যায় না। নাম থাকলেই তার একটা মানে আছে, বা ছিল; অথচ সমস্ত বাঙলা-দেশে (কেবল বোধ হয় দক্ষিণ সমতট-টুকু বাদ, কারণ এ অঞ্চলটায় নোতুন ক'রে লোকের বাস হ'য়েছে) এমন সব স্থানের নাম আছে, যার মানে খুঁজে' পাওয়া যায় না—কথাগুলি বাঙলার কথা মনেই হয় না, যদি আমরা এগুলোকে একটু বিচার করে দেখি। নিশ্চয় যখন এই সকল নাম দেওয়া হ'য়েছিল, তখন লোকে তার মানে বুঝত; কিন্তু নামগুলি ত বাঙলা নয়। তা হ'লে পূর্ব্বে এদেশে অ-বাঙালী লোক ছিল, যারা অন্য ভাষা ব'লত; তারা গেল কোথা? কপূরের মত উবে' গেল—যাতে আর্য্য-বংশধরেরা এসে' দয়া ক'রে বাস ক'রে, পাণ্ডব-বর্জ্জিত বাঙলা দেশকে পবিত্র ক'রতে পারেন?—না তারাই আর্য্যভাষী বৌদ্ধ প্রচারকদের কাছ থেকে, পশ্চিম থেকে আগত

মৌর্য্য আর গুপ্ত রাজাদের প্রেরিত রাজপুরুষদের কাছথেকে, উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ বেনিয়া সৈনিকের কাছথেকে আর্য্যভাষা শিখে' তাকে নিজেদের ভাবের উপযুক্ত ক'রে নিয়ে', রাঢ় বরেন্দ্র আর বঙ্গের বাঙলায় বদ্‌লে' ফেললে, বাঙালী-ভাষী জাতিতে পরিণত হ'ল? এবিষয়ে বাঙলায় মোটেই আলোচনা হয় নি; এক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেখিয়ে'ছেন যে উড়িষ্যা অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামাদির নাম দ্রাবিড় ভাষার; তা থেকে প্রমাণ হয় সেখানে দ্রাবিড় ভাষা আগে চ'লত। F. Hahn সাহেবও ছোট-নাগপুরে কোল ও দ্রাবিড় নাম দেখিয়ে'ছেন; উত্তর-বঙ্গের ও আসামের অনেক নাম তেমনি ভুটিয়া ও ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষা থেকে হ'য়েছে। অনেক সময়ে আবার এই সকল নামকে সংস্কৃত ক'রে আর্য্য ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু মিহিজাম, জামতাড়া, হাব্‌ড়া, চুঁচুড়া, সোমড়া, রিষড়া, মগরা, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, দোয়ার্‌পা, জান্‌পা, গুর্‌পা, পর্‌শা, পাণ্ডুয়া, সুড়ি, নাড়াজোল, জাগুলিয়া, শালিখা, জালিখা, নড়াইল, নন্দাইল, টাঙ্গাইল, কাঁথি, দেবড়া, ইগ্‌ড়া, কোলা, সান্থিয়া, সাঁইতিয়া, উলা, হাটবয়্‌রা, ভাদুড়িয়া, কান্দি, ভীলাকান্দি সরিয়াকান্দি, হাইলাকান্দি, বাঁকড়াগাছী, ঝাকৈর, জামুর, শিলিগুড়ী, জলপাইগুড়ী, ময়নাগুড়ী, ধুপগুড়ী, দীমরা, আটী, সাভার, জয়রা, ঝিটকা, জামুর্কী, বাসাইল, ছাপ্‌ড়া—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—এই সকল গ্রামের নামের মানে কি? অথচ এদেরই ইতিহাস ত আমাদের জাতের ইতিহাস। গ্রামের নামে প্রায় বাঙলাদেশময় একটা প্রত্যয় মেলে—সেটা 'ড়া' বা 'রা' বা 'লা'—এই প্রত্যয়ের মানে কি, আর এ কোন্ ভাষার কথা? বাঙালী জাতি, অর্থাৎ বাঙলা-ভাষী জাতি সৃষ্টি ক'রতে যে যে জাতির উপাদান লেগে'ছিল, তাদের ভাষা চর্চ্চা না ক'রলে এ-সবের

সমাধান হ'তে পারে না। আমাদের হাতে এখন মাল মশলা নেই। এইরূপ নামের লিস্‌ট্‌, বিশেষভাবে, যাঁরা এদিকে কাজ ক'রবেন, তাঁদের না হলে চ'লবে না। কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে' কোথায় অজানা-মানে কোন্ পাড়া বা নদীর বা জঙ্গলের নাম আছে, তাঁরা তা সংগ্রহ ক'রতে গেলে কাজ এগো'বে না। বাঙলার প্রত্যেক মহকুমা বা থানা থেকে ইস্কুলে কলেজে কত ছেলে পড়ে, তাদের কাজ হচ্ছে এইরকম সমস্ত নাম সংগ্রহ করা, আর তার যদি কোনও স্থানীয় ব্যাখ্যা থাকে, তাও যোগাড় করা। ক'রে, সাহিত্য পরিষদের মত স্থানে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে' দেওয়া—সেগুলি প্রকাশ হ'লে পর তার বিচার চ'ল্‌তে পারে।

এ ত গেল বাঙলা-ভাষার পুরানো ইতিহাসের কথা। চল্‌তি বাঙলার স্বরূপটি নানা দিক দিয়ে' বিশ্লেষ ক'রে দেখবার বিষয়। সেদিন ঢাকা থেকে বিরাট এক ব্যাকরণ বেরিয়ে'ছে দেখলুম—প্রায় ৮০০ পাতার বই। বাঙলার ব্যাকরণ দেখে' আগ্রহের সঙ্গে পাতা উল্টে' দেখি, লেখক বাঙলা কাকে বলে জানেন না। আগাগোড়া একখানি সংস্কৃতের ব্যাকরণ তিনি লিখে' গিয়েছেন। বাঙলার প্রত্যয়াদি তিনি দু'ভাগে ভাগ ক'রেছেন—সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত, আর অসাধু। তিনি যা অসাধু মনে ক'রেছেন, সঙ্কুচিত-ভাবে আলগোছে, বা কোন রকমে বর্ণনা ক'রে ছেড়ে' দিয়েছেন, তাই যে খাঁটী বাঙলা, সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। বাঙলার বিশুদ্ধ রূপটি হচ্ছে এর তত্ত্বর উপাদানটি। এটি বৈদিক থেকে উদ্ভূত, কিন্তু অন্-আর্য্য বা দ্রাবিড়ীয় ঢঙে এর বাক্য-রচনায় প্রয়োগ। বাঙলার এই নিজ রূপটি সংস্কৃতের অলঙ্কারের চাপে ঢাকা প'ড়েছে—একে বা'র ক'রে, এর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন কার সঙ্গে কতটা মেলে, এর যথার্থ

গোত্র-পরিচয় এর গুণাগুণ থেকে কতটা পাওয়া যেতে' পারে—এই সব নির্দ্ধারণ করাই হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বাঙলা ব্যাকরণের কাজ। কিন্তু পণ্ডিতেরা এর অলঙ্কারের যাচাই নিয়ে'ই ব্যস্ত,—সংস্কৃতের সোনা কতটা আর কতটা খাদ। সংস্কৃতের চাপে পড়ে বাঙলা কতটা যে অকর্ম্মণ্য ও অসহায় হ'য়েছে, কতটা একে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হ'তে হচ্ছে, তা হিন্দীর সঙ্গে তুলনা ক'রলে বুঝতে পারা যায়। বাঙলার কৃৎ, আর তদ্ধিত আর প্রত্যয়গুলি পঙ্গু; নোতুন শব্দ বাঙলায় সৃষ্টি করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি সাধারণ ইংরিজি কথা দিচ্ছি; singer, childhood, goer, current, redness, silence, manufacture, earning, goodness, 84th; এগুলির খাঁটি বাঙলা অনুবাদ কি? singer 'গায়ক' নয়, 'গায়ক' ত সংস্কৃত শব্দ; 'গাইয়ে' ব'ললে, যে ভাল গায় তাকে বুঝায়, 'হিন্দীতে গবহিয়া'; childhood—শৈশব—হিন্দী 'বচ্‌পন্'; goer—গমনকারী—'চল্‌নেহারা'; current—প্রচলিত—'চালু' ('চল্‌তি' শব্দ হিন্দী থেকে নেওয়া); redness—বাঙলায় কি? হিন্দী 'লালী'; silence—স্তব্ধতা—'সন্নাটা'। ('নিঝুম' বললে ঘুমের ভাব আসে); manufacture—নির্ম্মাণ, 'বনাবৃ'; earning—উপার্জ্জন, রোজগার—হিন্দী 'কমাঈ' goodness—'ভলাঈ'; 84th.—'চৌরাসীবাঁ'—বাঙলায়—চতুরশীতিতম। সংস্কৃতের অলঙ্কার বাঙলার বোঝা হ'য়েছে, বাঙলাকে জীবন্মৃত করে ফেলেছে। যতই আমরা আমাদের সাহিত্যের বড়াই করি না কেন, হিন্দীর কাছে সংস্কৃতের প্রেত-ঘাড়ে-করা বাঙলা দাঁড়াতে পারে না—হিন্দী যতটা জোরের ভাষা, বাঙলা ততটা নয়। বাঙলার 'নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণাগার' 'কৌতুকাগার', 'তাপমান যন্ত্র' প্রভৃতি

দাঁত-ভাঙ্গা শব্দ অচল ; হিন্দীর 'তারাঘর', 'জাদুঘর', 'গর্‌মী মাপ', রাস্তার লোকেও বোঝে। আজকালকার 'সাধু' হিন্দীর মন্দিরে বাঙলার অনুকরণে সংস্কৃতের অশথ গাছের বীজ চূড়োয় বসানো হ'য়েছে, কিন্তু তার জড় এখনও বেশী দূর যায় নি ; 'ঠেট-হিন্দী' ব'লে এক রকম রচনা রীতি হিন্দীতে এখনও চ'লচে, যাতে চেষ্টা ক'রে সংস্কৃত শব্দ পরিহার করা হয়, কেবল তদ্ভব আর প্রাকৃত ধাতু আর প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদই ব্যবহার করা হয়। হিন্দীতে হালে তিনখানা বই লেখা হ'য়েছে, সে তিনখানাতে একটিও পণ্ডিতী বা সংস্কৃত শব্দ বা ফারসী শব্দ নেই—সমস্তটাই খাঁটী দেশী আর তদ্ভব শব্দে পূর্ণ। তিনখানি বই-ই উপন্যাস—একখানি এক মুসলমানের লেখা, আর দুখানি এক হিন্দুর। তিনখানারই স্টাইল সকলেই প্রশংসা করেন ; এর একখানা বইকে আবার কাশীর নাগরী-প্রচারিণী-সভা, হিন্দীর ২২ খানি শ্রেষ্ঠ গদ্য বইয়ের মধ্যে একখানি ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। আজকালকার বাঙলায় এ রকম একটা ব্যাপার অসম্ভব। যাঁরা বাঙলা ব্যাকরণ আলোচনা করেন, তাঁরা যেমন বাঙলার নিজ স্বরূপটিরই ইতিহাসের পুনর্গঠন ক'রবেন, সেইরকম যাঁরা বাঙলা ভাষা সৎসাহিত্যে প্রয়োগ ক'রবেন, তাঁদের চেষ্টা করা উচিত যাতে বাঙলার এই পঙ্গু-ভাব দূর হয়—খাঁটী বাঙলা ধাতু প্রত্যয় সিদ্ধ পদের প্রচলন যেন বেশী হয়। যেখানে খাঁটী বাঙলা পদ মেলে না, বা না মিললে সৃষ্টি করা চলে না, সেখানেই যেন সংস্কৃতের কাছে কথা ধার করা হয়। চলতি ভাষায় প্রাদেশিক ভাষায় বাঙলার ঠিক মূর্ত্তির ফল্গু বইছে, এর অন্তঃসলিলা মূর্ত্তিকে প্রকট ক'রতে হবে। অসমীয়া-ভাষা বাঙলার বোন, বাঙলার কাছে অসমীয়া এখন দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু অসমীয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল।

বাঙলার প্রাকৃত বা তদ্ভব রূপটিই যে এর আসল রূপ, একথা রামমোহন রায় মেনে' গিয়ে'ছেন। কিন্তু ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের আর শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের হাতে প'ড়ে বাঙলা ভাষা ভোল ফিরিয়ে' ব'সল, বাঙলা ব্যাকরণ ব'লে লোকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি আর কৃৎ তদ্ধিত শব্দসিদ্ধি প'ড়তে লাগল। বিদেশী পণ্ডিত বীম্‌স্ আর হর্ণলে বাঙলার আসল রূপটি বের করবার প্রথম চেষ্টা ক'রলেন। ১২৮৮ সালে (ইংরিজি ১৮৮১) চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "ইংরাজী বাঙ্গলা ও নর্‌ম্যাল বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ" একখানি বাঙলা ব্যাকরণ লেখেন। আমার বোধ হয়, বাঙালীর হাতে তার মাতৃভাষার যথার্থ ব্যাকরণ লেখবার এই প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থকারের নাম এখন অজ্ঞাত, প্রায় চল্লিস বছর পূর্ব্বে তিনি লিখে'ছেন অথচ তিনি তাঁর মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা এখনও দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বভাষে ব'লেছেন ; "সংস্কৃত এবং দেশজ বাঙ্গলা এই উভয়বিধ শব্দই বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার উপাদান ; এতদ্বিধ ভাষার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে হইলে যেরূপ ভাষাগত সংস্কৃতশব্দসম্বন্ধে বৈয়াকরণ নিয়মবিধান করা কর্ত্তব্য, দেশজ বাঙ্গলা শব্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ কর্ত্তব্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এতাদৃশ বাঙ্গলাব্যাকরণ বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহা আমি জানি না ; প্রত্যুত আমার বিশ্বাস এই যে এতাদৃশ কোন ব্যাকরণ বঙ্গভাষায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং একখানি হওয়ারও প্রয়োজন আছে।" গ্রন্থকার বাঙলার তদ্ভব শব্দগুলির উৎপত্তি নির্ণয়ক সূত্র প্রণয়ন ক'রেছেন, তদ্ভব রূপটির বিশেষ আলোচনা ক'রেছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর "শব্দতত্ত্ব" তারপর খাঁটী বাঙলার সম্বন্ধে একখানি প্রধান মৌলিক

পুস্তক। রবিবাবুর পরে পূজনীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের "শব্দকথার" প্রবন্ধাবলীকে উল্লেখ করা যেতে' পারে। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর পরিষদের তরফ থেকে যে ব্যাকরণ বা'র ক'রেছেন, তা অতি চমৎকার জিনিস। তিনি তাঁর "বাঙ্গলা শব্দকোষ"-এ যতটা সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকে'ছেন, বাঙলার প্রকৃতি ঠিক মত বুঝে' লেখার দরুণ তাঁর "বাঙ্গলা ব্যাকরণে" খাঁটী বাঙলাই বাহাল আছে। তিনি একখানি সুন্দর বাঙলা ব্যাকরণ লিখে'ছেন—কিন্তু কাজ এখনও ঢের বাকী। ঐতিহাসিক আর তুলনামূলক পদ্ধতিতে সবদিক বিচার ক'রে আমাদের ভাষার ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি। বাঙলার ধ্বনি ও উচ্চারণ-তত্ত্ব এক অতি জটিল জিনিস—একে সহজে ধরা-ছোঁয়া যায় না—নানান্ জাতের বিশেষত্ব এতে লুকিয়ে' আছে—ধাতু আর শব্দরূপের মত উপর উপর থেকেই এর আলোচনা শেষ হ'তে পারে না। অথচ এই ধ্বনি আর উচ্চারণ-তত্ত্বেই বাঙলা ভাষার আধেকের উপর গুপ্ততত্ত্ব নিহিত র'য়েছে। পূজনীয় রবীন্দ্র বাবু বাঙলা উচ্চারণের আর বাঙলার ছন্দের মূল সূত্রগুলি ধ'রে দিয়ে'ছেন। এ বিষয়ে অল্প স্বল্প কাজ চ'লছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত—বিশেষত শাস্ত্রী মহাশয় 'অকারতত্ত্ব' ব'লে সম্প্রতি যে প্রবন্ধটা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ ক'রেছেন, তা অপূর্ব্ব, তাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে'ছেন।

ভাষাতত্ত্ব জিনিসটা আলোচনা ক'রবার অধিকার সকলেরই আছে। ভাষা সকলেই ব্যবহার করেন। এই বিদ্যা বা বিজ্ঞান চর্চ্চা ক'রতে গেলে ল্যাবরেটরী আর যন্ত্রপাতির দরকার নেই—মনই হচ্ছে এর রসায়নাগার। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত উপায়ে চর্চ্চা না ক'রলে কোনও

লাভ নেই, বরং উল্টো উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যার ব্যাকরণ শিখে' না নিয়ে' এতে হাত দিলে লোকে তাল ঠিক রাখতে পারে না—রকমারি হাস্যজনক ভুল ধারণায় প'ড়ে যায়। যাঁরা বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে' কিছু কাজ ক'রতে চান, তাঁরা আগে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার মূলসূত্রগুলি পড়ুন, এদেশের আর্য্য অনার্য্য ভাষাগুলির সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবর গুলি জানুন, বিদেশে আর্য্য ভাষাগুলির ইতিহাসেরও একটু পরিচয় ক'রে নিন। He knows not England who only England knows. যিনি কেবল বাঙলা, সংস্কৃত আর প্রাকৃতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত, অথচ প্রাচীন ঈরানীয় বা পুরানো গ্রীক, বা মধ্যযুগের রাজস্থানী, বা আনাম প্রদেশের ভাষা বা এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাগোষ্ঠীর কোনও খবর রাখেন না বা রাখা আবশ্যক মনে করেন না, তাঁর দ্বারা এ কাজ ভাল ক'রে হবে না। দু'রকমে একটি জিনিসকে বোঝা যায়—static আর dynamic—স্থিতিশীল বা আভ্যন্তরীন, আর গতিশীল বা বহির্মুখী হিসাবে। এ জ্ঞানে গভীরতা আর ব্যাপকতা দুই-ই চাই। নাড়ী নক্ষত্রের জ্ঞান চাই—ভিতরের সব খুঁটী-নাটীর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগতের খবরও সেই অনুপাতেই রাখতে হবে। অন্যথা আলোচনা একদেশদর্শী হ'য়ে প'ড়বে।

সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যরা বাঙলা ভাষার সেবায় কি কি কাজ ক'রতে পারেন তা পরিষদের পরিচালকগণ নিয়মাবলীতে ব'লে দিয়ে'ছেন। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কথা আমি ব'লতে পারি না—তবে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা সহজেই অনেক কাজ ক'রতে পারেন। যাঁদের এদিকে ঝোঁক আছে, তাঁদের বিশেষ ভাবে আমি ব'লছি, সংগ্রহের কাজে লেগে' যান। গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ, (শব্দগুলির

প্রয়োগের দৃষ্টান্তের সঙ্গে); বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে প্রযুক্ত শব্দ-সংগ্রহ (যেমন তাঁতীর কাজের যন্ত্রপাঁতির আর তার পা'টের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দ, কিম্বা নৌকা-ঘটিত সমস্ত শব্দ); নিজ নিজ থানা বা মহকুমার মধ্যে যে সকল নাম মিলে, যার মানে কেউ ক'রতে পারে না, সেই সকল নাম সংগ্রহ। এগুলি যোগাড় করা বিশেষ পরিশ্রমের কাজ নয়, এতে খুব বিদ্যার দরকার করে না, এর জন্যে কেবল কান একটু খাড়া রাখতে হয়, আর একখানা নোটবুকে যা শুনলুম আর অসাধারণ ব'লে মনে লাগল, সেগুলিকে টুকে রাখলেই হ'ল। এটি হচ্ছে বুনিয়াদ-কাটা মজুরের কাজ, কিন্তু এর সাহায্য না হ'লে দালান-কুঠী উঠতেই পারে না।

মুরুব্বিয়ানা চালে, যাকে ex-cathedra বলে, অনেকগুলি কথা ব'ললুম। এ বিষয়ে আমরা কি রকম ভাবে কাজ ক'রতে পারি, সে সম্বন্ধে আমার মনে যা এসে'ছে তাই আপনাদের গোচর ক'রলুম। এরূপ ভাবে ফরমাইস ক'রে যাওয়া আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, কারণ আমি এই পথের একজন সামান্য যাত্রী মাত্র; কিন্তু অনুরোধে প'ড়ে এই অনধিকার চর্চ্চা ক'রেছি, আপনারা আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাম ও শ্যাম।

—*—

শ্রীমান চিরকিশোর,

কল্যাণীয়েষু—

আর পাঁচজনের দেখাদেখি আমিও অতঃপর গল্প লিখতে সুরু করেছি, কেননা গল্প না লিখলে আজকাল সাহিত্য-সমাজে কোনরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে যে লিখি নি তার কারণ লেখবার এমন কোনও বিষয় দেখতে পাই নি, যা পূর্ব্ব-লেখকরা দখল করে না নিয়েছেন। শেষটা আবিষ্কার করলুম, বাঙলার গল্প-সাহিত্যে আদর্শ পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করা বড়ই দুর্লভ, যা দুর্লভ তাই সুলভ করবার উদ্দেশ্যেই আমার এ গল্প লেখা। আমার হাতের প্রথম গল্পটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমার মতে সেটি উৎরে থাকে, তাহলে পরে ঐ বিষয়ে একটি বড় গল্প লিখব, ক্রমে সাহস বেড়ে গেলে অবশেষে এই একই বিষয়ে চাই কি একটি মহাকাব্যও লিখতে পারি। একটা কথা বলে রাখি, মানুষে যাকে সুন্দর বলে এ গল্পের ভিতর তার নাম গন্ধও নেই—যদি কিছু থাকে ত, আছে শিব। আর সত্য?—গল্পের ভিতর ও-বস্তু সেই খোঁজে, যে ইতিহাস ও উপন্যাসের ভেদ জানে না। তোমার দৃষ্টির জন্য এইসঙ্গে গল্পটির জাবেদা নকল পাঠাচ্ছি।

গল্প।

প্রথম অঙ্ক।

স্বভাব।

বাঙলা দেশের একটি পাড়াগেঁয়ে-সহরে দু'কড়ি দত্তের সহধর্ম্মিণী যখন যমজ পুত্র প্রসব করলেন, তখন দত্তজা মহাশয় ঈষৎ মনঃক্ষুন্ন হলেন। এ দুই ছেলে বড় হলে যে কত বড় লোক হবে, সে কথা জানলে তাঁর আনন্দের অবশ্য আর সীমা থাকত না। কিন্তু কি করে তিনি তা জানবেন? এই কলিকালে কারও জন্মদিনে ত কোনও দৈববাণী হয় না, অতএব বলা বাহুল্য তাদের জন্মদিনেও হয় নি।

তবে ছেলে দুটির বিষয়বুদ্ধি যে নৈসর্গিক এবং অসাধারণ, তার পরিচয় সেইদিনই পাওয়া গেল। তারা ভূমিষ্ট হতে না হতেই, তাদের জননীকে আধাআধি ভাগ বাটোয়ারা করে নিলে। একটি দখল করে নিলে তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ, আর একটি দখল করে নিলে তাঁর বাম অঙ্গ, এবং এই সুবন্দোবস্তের ফলে, মাতৃদুগ্ধ তারা সমান অংশে পান করতে লাগল। মাতৃদুগ্ধ পান করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির নামই যদি হয় মাতৃ-ভক্তি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে,—এই ভাতৃযুগলের তুল্য মাতৃভক্ত শিশু ভারতবর্ষে আর কখনো জন্মায় নি। ফলে, তারা দুধ না ছাড়তেই তাঁদের মাতা দেহ ছাড়্‌লেন—ক্ষয়যোগে।

এখানে একটি কথার উল্লেখ করে রাখা আবশ্যক। এরা দু'ভাই এমনি পিঠ পিঠ জন্মেছিল যে, এদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট তা কেউ স্থির করতে পারলেন না। এইটেই রয়ে গেল এদের জীবনের আসল রহস্য, অতএব এ গল্পেরও আসল রহস্য। সে যাইহোক, কার্য্যত

দুই ভাই শুধু একবর্ণ একাকার নয়, এক-ক্ষণজন্মা বলে প্রসিদ্ধ হলো।

শুভদিনে শুভক্ষণে তাদের অন্নপ্রাশন হলো, এবং দত্তজা তাঁদের নাম রাখলেন—রাম ও শ্যাম। পৃথিবীতে যমজের উপযুক্ত এত খাসা খাসা জোড়া নাম থাকতে,—যেমন নকুল-সহদেব, হরি-হর, কানাই-বলাই প্রভৃতি, রাম শ্যামই যে দত্ত মহাশয়ের কেন বেশি পছন্দ হল, তা বলা কঠিন। লোকে বলে দত্তজা পুত্রদ্বয়ের আকৃতির নয়, বর্ণের উপরেই দৃষ্টিরেখে এই নামকরণ করেছিলেন। এই যমজের দেহের যে বর্ণ ছিল তার ভদ্র নাম অবশ্য শ্যাম। সে যাইহোক এটা নিশ্চিত যে, তাঁর পুত্রদ্বয় যে একদিন তাদের নাম সার্থক করবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। এতে তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। কারণ রাম-শ্যামের নাম-করণের সময় আকাশ থেকে ত আর পুষ্পবৃষ্টি হয় নি।

অনেকদিন যাবৎ রাম শ্যামের কি শরীরে, কি অন্তরে, মহাপুরুষ-সুলভ কোনরূপ লক্ষণই দেখা যায় নি। তারা শৈশবে কারও ননিচুরি করে নি, বাল্যে কারও মন-চুরি করে নি। তাদের বাল্যজীবন ছিল ঠিক সেই ধরনের জীবন যেমন আর পাঁচ জনের ছেলের হয়ে থাকে। ছেলেও ছিল তারা নেহাৎ মাঝারি গোছের, কিন্তু তা সত্বেও কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতে তারা স্কুলের ছেলেদের একদম দলপতি হয়ে উঠল। তাদের আত্মশক্তি যে কোন্ ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হবে, তার পূর্ব্ব সূচনা এইখান থেকেই সকলের পাওয়া উচিত ছিল।

সকল বিষয়ে মাঝারি হয়েও তারা সকলের মাথা হল কি করে? এর অবশ্য নানা কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তারা ছিল চৌকোশ। যে সব ছেলেরা পড়ায় ফার্ষ্ট হত—তারা খেলায়

লাষ্ট হত, আর যে সব ছেলেরা খেলায় ফার্ষ্ট হত—তারা পড়ায় লাষ্ট হত। পাছে কোন বিষয়ে লাষ্ট হতে হয়, এই ভয়ে তারা কোন বিষয়েই ফার্ষ্ট হয় নি। চৌকোশ হতে হলে যে মাঝারি হতে হয়, এ জ্ঞান তাদের ছিল; কেননা বয়েসের তুলনায় তারা ছিল যেমন সেয়ানা তেমনি হুঁসিয়ার।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাদের শরীরে এমন একটি গুণ ছিল, যা এদেশে ছোটদের কথা ছেড়ে দেও—বড়দের দেহেও মেলা দুষ্কর। তারা ছিল বেজায় কৃতকর্ম্মা ছেলে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে energetic. স্কুলের যত ব্যাপারে তারা হত যুগপৎ অগ্রগামী ও অগ্রণী। চাঁদা, সে ফুটবলেরই হোক আর সরস্বতী পুজোরই হোক, তাদের তুল্য আর কেউ আদায় করতে পারত না। উকিল মোক্তার-দের কথা ত ছেড়েই দাও, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদের বাড়ী পর্য্যন্ত তারা চড়াও করত এবং কখনো শুধু হাতে ফিরত না। তারা ছিল যেমনি ছট্‌ফটে তেমনি চট্‌পটে। একে ত তাদের মুখে খই ফুটত, তার উপর চোখ কোথায় রাঙাতে হবে ও কোথায় নামাতে হবে, তা তারা দিব্যি জানত। স্কুলের ছেলেদের যত রকম ক্লাব ছিল, এক ভাই হত তার সেক্রেটারি আর এক ভাই হত তার ট্রেজেরার। তারপর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে যত প্রকার আবেদন নিবেদন করা হত, রাম শ্যাম ছিল সে সবের যুগপৎ কর্ত্তা ও বক্তা। উপরন্তু মাষ্টারদের অভিনন্দন দিতেও তারা ছিল যেমন ওস্তাদ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও তারা ছিল তেমনি ওস্তাদ। এক কথায় সাবালক হবার বহুপূর্ব্বে তারা দুজনে হয়ে উঠেছিল, স্কুল-পলিটিক্সের দুটি অ-তৃতীয় নেতা।

এই নেতৃত্বের বলে, তারা স্কুলটিকে একেবারে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে

চাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন তারা দু'ভাই সেখানে ছিল ততদিন স্কুলটির জীবন ছিল, অর্থাৎ আজ নালিশ কাল সালিশ, পরশু ধর্ম্মঘট এই সব নিয়েই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। ফলে কত ছেলে বেত খেলে, কত ছেলের নাম কাটা গেল, কিন্তু রাম শ্যামের গায়ে যে কখনও আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগল না, সে তাদের ডিপ্লোমাসির গুণে। ডিপ্লোমাসি যে পলিটিক্সের দেহ, সে সত্য তারা নিজেই আবিষ্কার করেছিল।

তারপর পলিটিক্সের যা প্রাণ, অর্থাৎ পেট্রিয়টিজম সে বিষয়েও, আর কেউ ছিল না যে, রাম শ্যামের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে। স্ব-স্কুল সম্বন্ধে তাদের মমত্ববোধ এত অসাধারণ ছিল, যে আমি যদি জর্ম্মান দার্শনিক হতুম তাহলে বলতুম যে সমগ্র স্কুলের "সমবেত আত্মা" তাদের দেহে বিগ্রহবান হয়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাদের স্কুলের সঙ্গে অপর কোন স্কুলের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ হলে রাম শ্যাম তাতে যোগ দিত না বটে—কিন্তু সকলের আগে দাঁড়াত এবং প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমান বাক্যবর্ষণ করত,—কখনো স্বপক্ষকে উৎসাহিত করবার জন্য, কখনো বিপক্ষকে লাঞ্ছিত করবার জন্য। স্বপক্ষ জিৎলে তারা ইংরাজিতে "ব্রাভো" "হিপ হিপ হুররে" বলে তারস্বরে চিৎকার করত। আর বিপক্ষদল জিৎলে তারা প্রথমেই রেফারিকে জুঁয়োচোর বলে বসত, তাতে কেউ প্রতিবাদ করলে, রাম শ্যাম অমনি, my school right or wrong বলে এমনি হুঙ্কার ছাড়ত যে স্বদলবলের ভিতর সে হুঙ্কারে যাদের স্কুল পেট্রিয়টিজম প্রকুপিত হয়ে উঠত, তারা বেপরোয়া হয়ে, বিপক্ষদলের সঙ্গে মারামারি করতে লেগে যেত। মারামারি বাধবামাত্র রাম শ্যামের দেহ অবশ্য

এক নিমেষে সেখান থেকে অন্তর্ধান হত কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আত্মা বিরাজ করত। জানো ত আত্মার ধর্ম্মই এই যে, তা যেখানে আছে সেখানে সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু কোথায়ও তাকে ধরে-ছুঁয়ে পাবার যো নেই।

রাম শ্যামের এই বাল্যলীলা থেকে বোধ হয় তুমি অনুমান করতে পেরেছ যে, এরা দু'ভাই কলিযুগের যুগ ধর্ম্মের অর্থাৎ পলিটিক্সের—যুগল অবতার স্বরূপে এই ভু-ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শিক্ষা।

রাম শ্যাম ষোল বৎসরও অতিক্রম করলেন, সেইসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হলেন, অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। যেমন তেমন করে হোক্ হাতের পাঁচ রাখতে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এরপর তাঁরা কলকাতায় পড়তে এলেন। এইখান থেকেই তাঁদের আসল পলিটিক্সের শিক্ষা-নবিসি সুরু হল। কলেজে ভর্ত্তি হবামাত্র নিজের প্রতি তাঁদের ভক্তি যথোচিত বেড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁদের উচ্চ আশা সিমলাস্পর্দ্ধী হয়ে উঠল। সহসা তাঁদের হুঁস হল যে, স্কুল কলেজের মোড়লী করা-রূপ তুচ্ছ ব্যবসায়ের মজুরি তাঁদের মত শক্তিশালী লোকের পোষায় না। তাই তাঁরা মনস্থির করলেন, তাঁরা হবেন দেশ-নায়ক। এবং পলিটিক্সের মহানাটকের অভিনয়ে যাতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হতে পারেন, তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন।

মহানগরীর আবহাওয়া থেকে এ তথ্য তাঁরা দু'দিনেই উদ্ধার করলেন যে, এ যুগে ধর্ম্মবলও বল নয়, কর্ম্মবলও বল নয়, একমাত্র বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, ওরফে বাক্যবল। এ বল যে তাঁদের শরীরে আছে, তার পরিচয় তাঁরা স্কুলেই পেয়েছিলেন। স্বাক্ষরিত অভিনন্দনপত্র এবং বেনামী দরখাস্ত লিখে, জিভের জোরে একদিকে বড়দের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে, আর একদিকে ছোটদের কাছ থেকে ভয়ভক্তি আদায় করে তাঁরা বাক্যবলের কতকটা চর্চ্চা ইতিপূর্ব্বেই করেছিলেন, এবার তার সম্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন।

রাম শ্যাম যেমন এ ধরাধামে প্রবেশ করা মাত্র, তাঁদের জননীকে, আপোষে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে ভোগ দখল করে ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করামাত্র, তাঁরা তদ্রূপ আপোষে মা-সরস্বতীকে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে, ভোগ-দখল করতে ব্রতী হলেন। বাণীর একালে দুটি অঙ্গ আছে, এক রসনা আর এক লেখনী। রাম ধরলেন বক্তৃতার দিক, আর শ্যাম ধরলেন লেখার দিক। এর কারণ, স্কুলে থাকতেই তাঁরা প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, অভিনন্দন জবর হত রামের মুখে আর অভিযোগ জবর হত শ্যামের কলমে।

বলা বাহুল্য নৈসর্গিক প্রতিভার বলে, অচিরে রাম হয়ে উঠলেন একজন মহাবক্তা আর শ্যাম হয়ে উঠলেন একজন মহালেখক। যা এক কথায় বলা যায় রাম তা অনায়াসে এক-শ' কথায় বলতেন, আর যা এক ছত্রে লেখা যায়, শ্যাম তা অনায়াসে এক-শ' ছত্রে লিখতেন! রাম শ্যামের বক্তব্য অবশ্য বেশি কিছু ছিল না। তার কারণ যারা অহর্নিশি পরের ভাবনা ভাবে তারা নিজে কোন কিছু ভাববার কোন অবসরই

পায় না। ফলে, অনেক কথা বলে কিছু না বলার আর্টে তাঁরা Gladstone-এর সমকক্ষ হয়ে উঠলেন!

রামের মুখ ও শ্যামের কলম থেকে অজস্র কথা যে অনর্গল বেরত তার আরও একটি কারণ ছিল। জ্ঞানের বালাই ত তাঁদের অন্তরে ছিলই না, তার উপরে যে ধর্ম্ম শরীরে থাকলে, মানুষের মুখে কথা বাধে, কলমের মুখে কথা আটকায় সে ধর্ম্ম, অর্থাৎ সত্যমিথ্যার ভেদ-জ্ঞান, দুকড়ি দত্তের বংশধর যুগলের দেহে আদপেই ছিল না! এ জ্ঞানের অভাবটা যে পলিটিটিক্সে ও গল্প-সাহিত্যে কত বড় জিনিষ, সে কথা কি আর খুলে বলা দরকার?

যদি জিজ্ঞাসা করো যে তাঁরা এই অতুল বাক্-শক্তির চর্চ্চা কোথায় এবং কি সুযোগে করলেন, এক কথায়, কোথায় তাঁরা রিহার্সেল দিলেন?—তার উত্তর, কলেজের ছাত্রদের কলিকাতা সহরে, যতরকম সভাসমিতি আছে, রাম তাতে অনবরত বক্তৃতা করতেন এবং শ্যাম সে সবের লেখালেখির কাজ দু'বেলা করতেন, তার উপর নানা কাগজে নানা ছদ্ম-নামে নানা সত্যমিথ্যা পত্রও লিখতেন। সে সকল অবশ্য ছাপাও হত। বিনে পয়সায় লেখা পেলে কোন্ কাগজ ছাড়ে!

পূর্ব্বেই বলেছি, রাম শ্যামের বক্তব্য বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু যেটুকু ছিল তার মূল্য অসাধারণ। মাণিকের খানিকও ভাল, এ কথা কে না জানে? একেত তাঁদের ভাষা ছিল গালভরা ইংরেজি তার উপর ভাব আবার বুকভরা পেট্রিয়টিক, এই মাণকাঞ্চনের যোগ দেখলে, প্রবীনদেরই মাথার ঠিক থাকে না,—নবীনদের কথা ত ছেড়েই দেও। তাঁদের সকল কথা সকল লেখার মূলসূত্র ছিল এক। তাঁরা একালের ইউরোপের সঙ্গে সেকালের ভারতের তুলনা করে দেখিয়ে দিতেন যে,

একালের আর্থিক সভ্যতা সেকালের আধ্যাত্মিক সভ্যতার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত হেয়। তাঁরা এই মহাসত্য প্রচার করতেন যে, অতীত ভারতই পতিত ভারতকে উদ্ধার করবে, অপর কোনও উপায় নেই। রামের মুখে একথা শুনে, শ্যামের লেখায় এ কথা পড়ে, আমাদের সকলের চোখেই জল আসত, আর দু'চারজন উৎসাহী লোক ঘর ছেড়ে বনেও চলে গেল—অতীতের সন্ধানে। এরপর, রাম শ্যামের পেট্রিয়টিজমের খ্যাতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীর টপ্‌কে যে সমগ্র সহরে ছড়িয়ে পড়ল তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে ত হবারই কথা।

রাম শ্যাম দেশের অতীত সম্বন্ধে যতই বলা কওয়া করুন না কেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। দেশের ভবিষ্য-তের উপায় যাইহোক্, নিজের ভবিষ্যৎ যে বর্ত্তমানের সাহায্যেই গড়ে তুলতে হয়, এ জ্ঞান তাঁরা ভুলেও হারান নি। পাশ না করলে যে পয়সা রোজগার করা যায় না, আর বাক্যের পিছনে অর্থ না থাকলে তার যে কোনও বলই থাকে না,—এ পাকা কথাটা তাঁরা ভাল রকমই জানতেন। তাই তাঁরা যথাসময়ে বি এ এবং বি এল পাস করলেন, দুই-ই অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করলে লোকে বলত, খুব মুখস্থ করেছে আর থার্ড ডিভিসনে পাস করলে বলত, ভাল মুখস্থ করতে পারে নি। এই দুই অপবাদ এড়াবার জন্যই তাঁরা সেকেণ্ড ডিভিসনে স্থান নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন! মুখস্থ অবশ্য তাঁরা ঢের করেছিলেন, সে কিন্তু সেই সব বড় বড় ইংরেজি কথা, যা বক্তৃতার আর লেখার কাজে লাগে।

সংসারের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের তাঁরা যে কোন ক্ষেত্র দখল করবেন, সে বিষয়ে তারা একদম মনস্থির করে ফেললেন। রাম ঠিক করলেন

তিনি হবেন একজন বড় উকিল, আর শ্যাম ঠিক করলেন তিনি হবেন একজন বড় এডিটার। এরথেকে তুমি যেন মনে করোনা যে তাঁরা পলিটিক্সের দিকে পিঠ ফেরাবার বন্দোবস্ত করলেন। রাম শ্যাম অত কাঁচা, অত বে-হিসাবী ছেলে ছিল না। তারা বেশ জানত যে পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে তারা ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করবে আর একবার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারলে, দেশের লোক ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পলিটিক্সের নেতা করে দেবে।

এইখানে একটি কথা বলে রাখি। আকৃতি প্রকৃতিতে রামের সঙ্গে শ্যামের পোনেরো আনা তিন পাই মিল থাকলেও এক পাই গরমিল ছিল, যে গরমিল একবৃন্তে দুটি ফুলের মধ্যে চিরদিনই থেকে যায়।

প্রথম রামের ছিল মোটার ধাত, আর শ্যামের রোগার ধাত। দ্বিতীয়ত, রামের কণ্ঠস্বর ছিল ভেরীর মত, আর শ্যামের তুরীর মত, জোর অবশ্য দু'য়েরি সমান ছিল, কিন্তু একটা খাদের দিকে, আর একটা জিলের দিকে।

কালিদাস বলে গেছেন যে বড়লোকের প্রজ্ঞা তাদের আকারের সদৃশ হয়। এক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কবির কথা মিথ্যে নয়। দু'জনের মধ্যে রাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ, আর শ্যাম অপেক্ষাকৃত ব্যস্ত। রাম ছিল বেশি দরবারী, আর শ্যাম ছিল বেশি তকরারী। রামের কৃতীত্ব ছিল হিক্‌মতে, শ্যামের হুজ্জুতে। রাম সিদ্ধহস্ত ছিল দল পাকাতে, আর শ্যাম দল ভাঙাতে। এক কথায় দলাদলী ছিল রামের পেশা, আর শ্যামের নেশা। রামের motto ছিল আগে ভেদ তারপরে সাম, আর শ্যামের motto ছিল আগে ভেদ তারপরে বিগ্রহ; কেন না রাম চাইতেন লোকে তাঁকে ভক্তি করুক আর শ্যাম চাইতেন লোকে তাঁকে ভয় করুক। তাঁদের চরিত্রের প্রভেদটা একটি ব্যাপার থেকেই স্পষ্ট দেখান যায়। আগেই বলেছি যে, স্কুলকলেজে যত প্রকার সভাসমিতি ছিল, এই ভাতৃযুগল সে সবের সেক্রেটারি ও ট্রেজারের পদ অধিকার করে বসতেন। কিন্তু রাম বরাবর ট্রেজারারই হতেন আর শ্যাম সেক্রেটারি।

এহেন চরিত্র এহেন বুদ্ধি নিয়ে রাম ও শ্যাম যখন সংসারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, তখন সকলেই বুঝল যে, তাঁরা জীবনে একটা বড় খেলা খেলবেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

পেট্রিয়টিজম।

যিনি মহাপুরুষ-চরিতের চর্চ্চা করেছেন তিনিই জানেন যে, তাঁদের জীবনের একটা ভাগ তাঁরা অজ্ঞাতবাসে কাটান; সে সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন, কি করেছেন, সে খবর কেউ জানে না।

কলেজ ছাড়বার পর রাম শ্যাম দশ বৎসরের জন্য লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। এ কয় বৎসর তাঁরা যে কোথায় ছিলেন, এবং কি করেছেন, সে খবর কেউ জানে না।

তারপর স্বদেশী যুগে তাঁদের পুনরাবির্ভাব হলো। "বন্দে মাতরম"-এর ডাক শুনে তাঁদের সুপ্ত মাতৃভক্তি আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না, অমনি অজ্ঞাতবাস ছেড়ে প্রকাশ্য মাতৃসেবায় লেগে গেলেন। যে অগাধ মাতৃ-ভক্তি শৈশবে তাঁদের গর্ভধারিণীর হৃদয়ের উপর ন্যস্ত ছিল, পূর্ণযৌবনে তা তাঁদের জন্মভূমির পৃষ্ঠে গিয়ে ভর করলে। লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

বাতাসের স্পর্শে জল যেমন নেচে ওঠে, আগুণের স্পর্শে খড় যেমন জ্বলে ওঠে, রামের রসনা আর শ্যামের লেখনীর স্পর্শে, আমাদের হৃদয় তেমনি উদ্বেলিত আন্দোলিত হয়ে উঠল, আমাদের উৎসাহ তেমনি সংধুক্ষিত প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

এবার তাঁরা ধরলেন এক নতুন সুর। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অতীতকে তাঁরা টেঁকে গুঁজে, ভারতবর্ষের আর্থিক ভবিষ্যতের তাঁরা ব্যাখ্যান সুরু করলেন। তাঁদের বাক্যবলে সে ভবিষ্যৎ অন্নবস্ত্রে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ছবি দেখে সকলেরি মুখে জল এল। যারা পূর্ব্বে বনে চলে গিয়েছিল তারা আবার ঘরে ফিরে এল।

রাম যখন স্পষ্ট করে বললেন যে, "আমি দেশের চিনি খাব" আর শ্যাম যখন স্পষ্ট করে লিখলেন যে, "আমি দেশের নুন খাব"—তখন আর কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে, তাঁরা দু'জনে একালের যুগধর্ম্ম প্রচার করতে এসেছেন, অমনি আমাদের মনে তাঁদের প্রতি ভক্তি উৎলে উঠল।

যুগধর্ম্মের প্রচারের যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য দেশের লোক চাঁদা করে টাকা তুলে শ্যামের জন্য একখানি ইংরেজি কাগজ বার করে দিলেন, সে কাগজের নাম হ'ল—Nationalist. শ্যামের হাতে পড়ে সেখানি হয়ে উঠল—একখানি চাবুক। শ্যাম সজোরে তা আকাশের উপর চালাতে লাগলেন, তার পটপটানির আওয়াজে, আকাশ বাতাস ভরে গেল। সেই রণবাদ্য শুনে আমাদের বুকের পাটা দশগুণ বেড়ে গেল।

কথায় বলে, দিন যেতে জানে ক্ষণ যেতে জানে না। শ্যামের ভাগ্যে ঘটলও তাই। এই চাবুক দৈবাৎ একদিন একটি বড় সাহেবের

গায়ে লেগে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্যামের বিরুদ্ধে মানহানীর নালিশ করলেন। দেশময় রৈ রৈ হৈ হৈ পড়ে গেল।

যথাসময়ে ফৌজদারী আদালতে শ্যামের বিচার হল। এবং এই সূত্রে রাম তাঁর অ-সাধারণ আইনের জ্ঞান ও অ-সামান্য ওকালতি-বুদ্ধি দেখাবার একটি অ-পূর্ব্ব সুযোগ পেলেন। রামের জেরার জোরে বাহাজের বলে, আইনের হিক্‌মতে মামলা মাজপথেই ফেঁসে গেল। রাম নিম্ন আদালতে আইনের যে সব কূটতর্ক তুলেছিলেন, সে তর্ক এখানে তুললে তুমি ভেবড়ে যাবে, কেননা তার মর্ম্ম তুমি বুঝতে পারবে না; বেচারা মাজিষ্ট্রেটও তার নাগাল পায় নি। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কি রকম বুদ্ধি খেলিয়ে ছিলেন, তার একটা পরিচয় দেই। রাম এই আপত্তি তুললেন যে, ইংরেজের ইংরাজর যা মানে, শ্যামের ইংরাজির সে মানে করলে, আসামীর উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হবে। কেননা শ্যাম যে ভাষা লেখেন সে তাঁর নিজস্ব-ভাষা, এক কথায় সে হচ্ছে শ্যামের স্বকৃত-ভঙ্গ ইংরাজি! বাঙলা খুব ভাল না জানলে সে ইংরাজির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ফরিয়াদির সাহেব-কৌঁচুলি এ আপত্তির আর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না, কেননা তিনি একথা অস্বীকার করতে পারলেন না যে, শ্যামের ইংরাজি ইংলণ্ডের ইংরাজি নয়। শ্যাম খালাস হলেন। লোকে রাম শ্যামের জয় জয়কার করতে লাগল।

শ্যাম যে দিন খালাস পেলেন, বাঙলার সেদিন হ'ল—ইংরাজরা যাকে বলে, একটি লাল হরফের দিন। লোকের অমন আনন্দ অমন উল্লাস, সেদিনের পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নি।

এমন কি এই ফচ্‌কে কলকাতা সহরের লোকরাও সেদিন যে কাণ্ড

করেছিল তা এতই বিরাট যে বীরবলী ভাষায় তার বর্ণনা করা অসাধ্য, তার জন্য চাই মেঘনাদবধের কলম। রাম শ্যামকে একটি ফিটানে চড়িয়ে হাজার হাজার লোক বড়রাস্তা দিয়ে সেই ফিটান যখন টেনে নিয়ে যেতে লাগল, তখন পথ ঘাট সব লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, এত লোক বোধ হয় জগন্নাথের রথ যাত্রাতেও একত্র হয় না। লোক বললে রাম শ্যাম কৃষ্ণার্জ্জুন। তারপর এই যুগলমূর্ত্তি দেখবার জন্য জনতার মধ্যে এমনি ঠেলাঠেলি মারামারি লেগে গেল যে, কত লোকের যে হাত পা ভাঙ্গলে তার আর ঠিক ঠিকানা নেই।

আমি ভিড় দেখলে ভড়কাই—ওর ভিতর পড়লে বেঁহোস হয়ে যাবার ভয়ে, এবং সেই ভয়ে চড়কের সং দেখাছাড়া অপর কোনও শোভাযাত্রা দেখতে কখনও ঘর থেকে বার হইনে। কিন্তু সেদিন উৎসাহের চোটে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। চোর-বাগানের মোড়ে গিয়ে যখন দেখলুম যে, চিৎপুরের দুধারি থেকে রাম শ্যামের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, তখন আমার চোখেও জল এসেছিল। আর কোনও গুণের না হোক পেট্রিয়টিজমের সম্মান যে বাঙালী করতে জানে, সেদিন তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেল।

এইখান থেকেই দেশ আবার মোড় ফিরলে; অর্থাৎ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই স্বদেশী আন্দোলন উপরের চাপে বসে গেল। কত ছা-পোষা লোকের চাকরি গেল, কত ছেলের স্কুল থেকে নামকাটা গেল, কত যুবক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হল, বাদবাকী আমরা সব একদম দমে গেলুম। রাম শ্যামের গায়ে কিন্তু আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগল না। অনেক কথা বলে কিছু না বলার আর্টের যে কি গুণ, এবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁরা অবশ্য দমেও গেলেন না। এ দুই ভাই

এই হাঙ্গামার ভিতর থেকে শুধু যে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন তাই নয়—তাঁদের মনেরও কোন জায়গায় আঘাত লাগল না; কেননা স্বদেশীর সকল কথাই দিবারাত্র তাঁদের মুখের উপরই ছিল, তার একটি কথাও তাঁদের বুকের ভিতর প্রবেশ করবার ফুরসৎ পায়নি।

রামের ওকালতির সনন্দ আর শ্যামের খবরের কাগজ দুই-ই অবশ্য তাঁদের হাতেই রয়ে গেল। তারপর দেশ যখন জুড়ল, তখন রামের ওকালতির পশার ও শ্যামের কাগজের প্রসার, শুক্ল-পক্ষের চন্দ্রের মত দিনের পর দিন আপনা হতেই বেড়ে যেতে লাগল। শেক্সপিয়র বলেছেন যে, মানুষমাত্রেরই জীবনে এমন একটা জোয়ার আসে, যার মুঠি চেপে ধরতে পারলে তার কাঁধে চড়ে যেখানে প্রাণ চায়, সেখানেই যাওয়া যায়। যে স্বদেশীর জোয়ারে আমরা সকলেই হাবু-ডুবু খেলুম এবং অনেকে একেবারে ডুবে গেল, রাম শ্যাম তার কাঁধে চড়ে একজন বড় উকিল আর একজন বড় এডিটার হতে চললেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

ইভলিউসান।

অবতারের কথা হচ্ছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। মহাপুরুষদের লীলাও নিত্য-লীলা নয়। তাঁরা অনাবশ্যকে দেখা দেন না, যখন দরকার বোঝেন তখনই আবার আবির্ভূত হন।

স্বদেশী আন্দোলন চাপা পড়বার ঠিক দশ বৎসর পরে রাম শ্যাম রাজনীতির আসরে আবার সদর্পে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু সে এক নব মূর্ত্তিতে, যুগল রূপে নয়—স্ব স্ব রূপে। তাঁদের উভয়ের-ই চেহারা

আর সাজগোজ ইতিমধ্যে এতটা বদ্‌লে গিয়েছিল যে, তাঁদের দু'জনকে যমজভ্রাতা ত অনেক দূরের কথা, পরস্পরের ভ্রাতা বলেই চেনা গেল না।

রামের দেহটি হয়েছিল ঠিক ঢাকের মত আর শ্যামের হয়েছিল তার কাটির মত, এর কারণ রামের হয়েছিল বহুমূত্র আর শ্যামের শ্বাসরোগ।

তাদের বেশভূষাও একদম বদ্‌লে গিয়েছিল। এবার দেখা গেল, রামের দাড়ি-গোঁফ দুই-ই কামানো, মাথার চুল কয়েদিদের ফ্যাসানে ছাঁটা এবং পরণে ইংরেজি পোষাক। হটাৎ দেখতে পাকা বিলেত ফেরত বলে ভুল হয়। অপরপক্ষে শ্যামের দেখা গেল, দাড়ি গোঁফ চুল সবই অতি প্রবৃদ্ধ, পরণে থানধুতি, গায়ে আঙরাখা, পায়ে তালতলার চটি, হঠাৎ দেখতে ঘোর থিয়জফিষ্ট বলে ভুল হয়।

এ হেন রূপান্তরের কারণ, ইতিমধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় উকিল আর শ্যাম হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় এডিটার! এই বড় হবার চেষ্টার ফলেই তাঁদের এতাদৃশ বদল হয়েছিল। রামের পশার যেমন বাড়তে লাগল, তিনি চালচলনে তেমনি সাহেবি-আনার দিকে ঝুঁকতে লাগলেন, আর যত তিনি সেই দিকে ঝুঁকতে লাগলেন, তত তাঁর পশার বাড়তে লাগল। অপরপক্ষে শ্যামের কাগজের প্রসার যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকতে লাগলেন; আর যত তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকতে লাগলেন—তত তাঁর কাগজের প্রসার বাড়তে লাগল।

তাঁরা যে দুটি রোগ সংগ্রহ করেছিলেন, সেও ঐ বড় হবার পথে। এদেশে মস্তিষ্কের বেশি চর্চ্চা করলে যে বহুমূত্র হয়, আর হৃদয়ের বেশি চর্চ্চা করলে হাঁপানি হয়, একথা কে না জানে।

বাইরের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনের চেহারাও ফিরে গিয়েছিল।

এই দশ বৎসরের মধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন রিফরমার, আর শ্যাম একজন নব্য-হিন্দু। সমাজ সংস্কার ছাড়া রামের মুখে অপর কোনও কথা ছিল না, আর বেদান্ত ছাড়া শ্যামের মুখে অপর কোনও কথা ছিল না। রাম বলতেন বাল্য-বিবাহ বন্ধ না হলে দেশের কোনও উন্নতি হবে না, আর শ্যাম বলতেন "অথাতো ব্রহ্ম" জিজ্ঞাসা না করলে দেশের কোনও উন্নতি হবে না। রাম বলতেন যে দেশের লোক যদি শক্তিশালী হতে চায় ত তাদের Eugenies মেনে চলতে হবে, আর শ্যাম বলতেন, ওর জন্য "শাস্ত্রযোনীত্বাৎ" মেনে চলতে হবে। রাম বলতেন জাতিভেদ তুলে দিতে হবে, শ্যাম বলতেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ফিরে আনতে হবে। এক কথায় রাম দোহাই দিতেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আর শ্যাম প্রাচ্য দর্শনের।

এর থেকে অবশ্য মনে করো না যে, আচারে বিচারে রাম শ্যামের ভিতর কোনরূপ প্রভেদ ছিল। যে কৌশলে কথা মুখে রাখলেও তা পেটে যায় না—সে কৌশলে তাঁরা চিরাভ্যস্ত ছিলেন। রাম তাঁর মেয়েদের যথাসময়ে অর্থাৎ দশ বৎসর বয়েসেই পাত্রস্থ করতেন,—প্রধানত পাত্রের জাত ও কুল দেখে, আর নিত্য মুরগি না খেলে শ্যামের অম্বল হত, আর চায়ের বদলে Bovril না খেলে তিনি জোর কলমে লেখবার মত বুকের জোর পেতেন না। সুরা অবশ্য দুজনেই পান করতেন, উভয়ে কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক রসের রসিক ছিলেন না। রাম খেতেন হুইস্কি আর শ্যাম ব্রাণ্ডি।

রাম শ্যামের কথার সঙ্গে কাজের এই গরমিলটা ইউরোপে অবশ্য

দোষ বলে গণ্য হ'ত—তার কারণ ইউরোপের মোটা বুদ্ধি, সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক-সত্যের প্রভেদটা ধরতে পারে নি। রাম এ সত্য জানতেন যে, সত্য কাজে লাগে অপর লোকের, আর শ্যাম জানতেন যে ও-বস্তু কাজে লাগে পরলোকের। নিজের ইহলোকের জীবন সুখে যাপন করতে হলে যে ব্যবহারিক সত্য মেনে চলতে হয়, এ জ্ঞান রাম শ্যাম দুজনেরই সমান ছিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

পলিটিক্স।

এবার অবশ্য দুজনে দু-দলের নায়ক হয়েই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। রাম হলেন দক্ষিণ মার্গের মহাজন ও শ্যাম বাম মার্গের। এর কারণ শৈশবে রাম লালিত-পালিত হয়েছিলেন মা'র ডান কোলে আর শ্যাম তাঁর বাঁ কোলে।

দু'দলে যুদ্ধের সূত্রপাত হল সেই দিন, যেদিন তারে খবর এল যে, জর্ম্মানরা চাই কি ভারতবর্ষের উপরেও চড়াও হতে পারে।

এই সংবাদ যেই পাওয়া অমনি রাম প্রকাশ্য সভায় বজ্রগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করলেন,—"আমি যুদ্ধ করব"। দেশের বাতাস অমনি কেঁপে উঠল। শ্যাম তার ঠিক পরের দিনই নিজের কাগজে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখলেন "আমি যুদ্ধ করব না"। দেশের আকাশ অমনি চমকে উঠল।

রাম শ্যামের এই দৃঢ় সংকল্পের সংবাদ শুনে, যুদ্ধের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভীত কিম্বা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, অদ্যাবধি তার কোনও পাকা খবর

পাওয়া যায় নি; সম্ভবত আগামী Peace Conference-এ সে কথা প্রকাশ পাবে।

কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ফল হল এই যে, স্বদেশ রক্ষা আগে না স্ব-রাজ্য লাভ আগে এই নিয়ে দেশময় একটা মহাতর্ক বেধে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা রক্ষণশীল তারা হল রাম-পন্থী আর যারা অরক্ষণশীল তারা হল শ্যাম-পন্থী। রামের দল হল ওজনে ভারি আর শ্যামের দল হল সংখ্যায় বেশি। তার কারণ যারা মোটা তারা হল রামের চেলা, আর যারা রোগা তারা হল শ্যামের চেলা। বাঙলাদেশে মোটাদের চাইতে রোগারা যে দলে ঢের বেশি পুরু—সে কথা বলাই বেশি। এর পর দু'দলে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে বেধে যাবে, সে কথা সকলেই টের পেলে। দেশের জন্য যারা কেয়ার করে তারা মনমরা হয়ে গেল; যারা করে না তারা তামাসা দেখবার জন্য উৎসুক হল; যারা ঘুমিয়ে আছে—তারা একবার জেগে উঠে আবার পাশ ফিরে শুলে। আর বিলেতি কাগজ-ওয়ালারা মহানন্দে বলতে লাগল,—"নারদ" "নারদ"।

যুদ্ধের প্রস্তাবে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল, রিফরমের প্রস্তাবে সে যুদ্ধ দস্তুরমত বেধে গেল।

রিফরমের প্রতি রাম হলেন দক্ষিণ আর শ্যাম হলেন বাম। এ দেশের মেয়েরা বাড়ীতে ছেলে হলে যে রকম আনন্দে নৃত্য করে, রাম সেই রকম নৃত্য করতে লাগলেন,—আর মেয়ে হলে তারা যে রকম হা-হুতাশ করে, শ্যাম সেই রকম হা-হুতাশ করতে লাগলেন। রাম বললেন, "রিফরম গ্রাহ্য কিন্তু তার বদল চাই"। শ্যাম অমনি বলে উঠলেন—"রিফরম অগ্রাহ্য, কেননা তার বদল চাই"।

এই দুটি বাক্যের ভিতর এক syntax ছাড়া আর কি প্রভেদ আছে—দেশের লোকে প্রথমে তা ঠাহর করতে পারে নি; তারা মনে করেছিল যে, একই কথা রাম বলছেন—positive আকারে আর শ্যাম বলছেন negative আকারে। তাঁদের সে ভুল তাঁরা দু'দিনেই ভাঙ্গিয়ে দিলেন।

রাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, শ্যামের মত "নেতি মূলক" আর শ্যাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, রামের মত "ইতি-অন্ত", তখন আর কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে, রিফরমার ও বৈদান্তিকে যা প্রভেদ এ উভয়ের মধ্যে ঠিক সেই প্রভেদ আছে; অর্থাৎ দক্ষিণ মার্গ হচ্ছে পাশ্চাত্য আর বাম মার্গ হচ্ছে প্রাচ্য।

এর পর দু'দলে প্রকৃত লড়াই লাগল। রাম শ্যাম উভয়েই কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়ে গেলেন। স্বদেশী যুগে একজন করতেন বক্তৃতা আর একজন লিখতেন কাগজ। কিন্তু স্বরাজের যুগে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুন প্রত্যেককেই অগত্যা যুগপৎ লেখক ও বক্তা হতে হ'ল। অর্থাৎ দু'জনেই আবার বাল্য-জীবনে ফিরে গেলেন। শ্যাম বক্তৃতা সুরু করে দিলেন, আর রাম কাগজ বার করলেন। সে কাগজের নাম রাখা হল Rationalist.

বলা বাহুল্য Rationalist-এর সঙ্গে Nationalist-এর তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বেধে গেল। Rationalist খুলে দেখো তাতে Nationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই, আর Nationalist খুলে দেখো তাতে Rationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই।

নির্বিবাদী লোক বাঙলাতেও আছে এবং নির্বিবাদী বলে তারা

যে একেবারে নির্ব্বোধ কিম্বা পাষণ্ড, তাও নয়। ব্যাপার দেখে শুনে এই নিরাহের দল তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে ঘরে বসে থাকার ফল হচ্ছে শুধু ঘরের ভাত বেশি করে খাওয়া, এতেকরে দেশের যে কোনও উপকার হয় না, সে জ্ঞান এই নিরপেক্ষ দলের ছিল। শেষটা তাঁরা রাম শ্যামের ভিতর একটা অপোষ মীমাংসা করে দেবার জন্য হরিকে তাঁদের কাছে দূত পাঠালেন। হরিকে পাঠাবার কারণ এই যে, তারতুল্য গো-বেচারা এদেশে খুব কমই আছে, তার উপর সে ছিল রাম শ্যামের চিরানুগত বন্ধু।

হরি প্রস্তাব করলে যে, দু'জনে মিলে যদি Rational-nationalist কিম্বা National-rationalist হন তাহলে দুদিক রক্ষা পায়। এ প্রস্তাব অবশ্য উভয়েই বিনা বিচারে অগ্রাহ্য করলেন, কেননা দু'জনের-ই মতে rationalism এবং nationalism হচ্ছে, দিনরাতের মত ঠিক উল্টো উল্টো জিনিষ; একটি যেমন সাদা আর একটি তেমনি কালো, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ও-দুই কিছুতেই এক হতে পারে না। হরি মধ্যস্থতা করতে গিয়ে বেজায় অপদস্থ হলেন! রামের চেলারা তাঁকে বললেন কবি, আর শ্যামের চেলারা দার্শনিক। হরির লাঞ্ছনা দেখে, আর কেউ সাহস করে মিটমাট করতে অগ্রসর হল না।

দলাদলী থেকেই গেল, শুধু থেকে গেল না, ভয়ঙ্কর বাড়তে লাগল। ঢাকে কাঠিতে যখন মারামারি বাধে তখন মানুষের কান কি রকম ঝালাপালা হয়, তা ত জানই। দেশের লোক মনে মনে বললে, এখন থামলে বাঁচি, কিন্তু এই গোল থামা দূরে থাক ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেও কতকটা রাম শ্যামের চালের গুণে।

এতদিনে রাম শ্যামের এ জ্ঞান জন্মেছিল যে, বাঙলাতে কোনও

বাঙালীকে বড় লোক বলে মানে না, যতক্ষণ না সে মরে। অতএব পরস্পরের সঙ্গে পলিটিক্সের লড়াই নিরাপদে লড়তে হ'লে উভয়ের পক্ষেই এক একটি বিদেশী শিখণ্ডি সুমুখে খাড়া করা দরকার। কেননা বাঙালীর বিশ্বাস মানুষের মত মানুষ দেশে নেই, আছে শুধু বিদেশে।

রাম তাই মুরুব্বি পাকড়ালেন বোম্বাইয়ের চোরজি ক্রোড়জি কলওয়ালাকে। Rationalist অমনি লিখলে,—কলওয়ালার মত অত বড় মাথা ভারতবর্ষে আর কারও নেই।

অপরপক্ষে শ্যাম মুরুব্বি পাকড়ালেন মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্ত্তি গৌরীপাদং আইনআচারিয়ারকে। Nationalist অমনি লিখলে,—"আইন-আচারিয়ারের মত অত বড় বুক ভারতবর্ষে আর কারও নেই।

এর জবাবে Rationalist লিখলে,—"অব্রাহ্মণের যে ছায়া মাড়ায় না, সেই হ'ল শ্যামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দ্দার"। পাল্টা জবাবে Nationalist লিখলে—"কলের কুলির রক্ত চুষে যে জোঁকের মত মোটা ও লাল হয়েছে—সেই হ'ল রামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দ্দার। বেচারা কলওয়ালা—বেচারা আইনআচারিয়ার! দু'জনেই সমান গাল খেতে লাগল।

যে সব বাঙালী দলাদলীর বাইরে ছিল, তারা এক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেননা বাঙলার নেতাদ্বয় স্বজাতকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাঙালীর মাথাও নেই, বুকও নেই, যে ক'জনের আছে তারা হয় এ-দলে নয় ও-দলে ভর্ত্তি হয়েছে। এ কথার পর আমাদের আর মুখ থাকল না। লজ্জায় আমরা অধোবদন হয়ে গেলুম।

কিন্তু সব দেশেই এমন দু'চার জন অবুঝ লোক থাকে—যারা কোনও জিনিষ সহজে বোঝে না। তারা ধরে নিলে যে, মেড়া লড়ে খোঁটার

জোরে, সুতরাং তারা সেই খোঁটার অনুসন্ধানে বেরল, এবং দু'দিনেই তার খোঁজ পেলে। রাম ও শ্যাম দুজনেই তাদের কানে কানে বললেন যে, তাঁদের পিছনে আছে,—বিলেত। রামের বিশ্বাস তিনি হাতিয়েছেন বিলেতের capital আর শ্যামের বিশ্বাস তিনি হাত করেছেন বিলেতের labour। এই ভরসায় দু-পক্ষেরই বড়েরা মনে করলে যে তারা নির্ঘাত মন্ত্রী হবে। এর পর দুদলের কি আর মিল হয়? যা হতে পারে সে হচ্ছে একদম ছাড়াছাড়ি এবং হলও তাই।

রাম স্বদলবলে দ্বারিকায় গিয়ে এক মহাসভা করলেন, আর শ্যাম রামেশ্বরে গিয়ে আর এক মহাসভা করলেন। ফলে একদিকে মোটা ভাই চোটাভাই বাট্‌লিওয়ালা কাথ্‌লিওয়ালাদের আনন্দে বাক্‌রোধ হয়ে গেল, অন্য দিকে বেঙ্কট কেঙ্কট জম্বুলিঙ্গম কোটিলিঙ্গমদেরও উৎসাহে দশা ধরলে।

রামের চেলারা বললেন—"আমরা ভারতবর্ষে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করব", শ্যামের চেলারা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"আমরা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-রাজ্যের সংস্থাপন করব"। Nationalist বিপক্ষের উপরে এই বলে চাপান দিলে যে, তোমরা যা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছ "তার নাম রাম-রাজ্য নয়, তোমাদের আরাম-রাজ্য"। Rationalist উতোর গাইলে —"তোমরা যার স্থাপনা করতে চাচ্ছ—তার নাম ধর্ম্মরাজ্য নয়—তোমাদের ধর্ম্মঘট"।

লাভের মধ্যে দাঁড়াল এই যে, বাঙলায় রিফরমের কথাটা চাপা পড়ে গেল, তার পরিবর্ত্তে রাম বড় না শ্যাম বড় এইটে হয়ে উঠল আসল মীমাংসার বিষয়। ছেলেবেলায় রাম শ্যামের জীবনের যেটা ছিল রহস্য, সেইটে হয়ে উঠল এখন সমস্যা।

এ সমস্যার মীমাংসা আজ করা কিন্তু অসম্ভব, কেননা "স্বরাজ" এখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত আকাশে ঝুলছে, অতঃপর তা উড়ে স্বর্গে যাবে, কি ঝরে মর্ত্ত্যে পড়বে, সে কথা রামও বলতে পারেন না শ্যামও বলতে পারেন না। হরি বলে, ও এখন অনেক দিন ঐ মাথার উপরেই ঝুলবে। কিন্তু ধরো যদি যে, রিফরম-স্কিমটি যেমন আছে ঠিক তেমনি এদেশে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেই যে এ সমস্যার মীমাংসা হবে, তাই বা কি করে বলা যায়? হয়ত তখন দেখা যাবে যে, রাম হয়েছেন বাঙলার Finance minister, আর শ্যাম হয়েছেন তার Chief-secretary! তাহলে?—

তবে একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, ভারত-মাতা রাম শ্যামের টানা-টানিতে নিশ্চয়ই খাড়া হয়ে উঠবেন, যদি ইতিমধ্যে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, এবং তা ঘটবার সম্ভাবনা যে নেই, সে কথা চোখের মাথা না খেলে বলবার যো নেই। মা এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক মারাত্মক জ্বরোগে যে-রকম আক্রান্ত হয়েছেন, তাতেকরে, তাঁর পক্ষে হঠাৎকারে রাম শ্যামের হাত এড়িয়ে চলে যাবার আটক কি?—"আমার কথা ফুরল নটে গাছটি মুড়ল"।

বীরবল।

পুনশ্চ।

এ গল্প পড়ে আমার গৃহিণী বললেন—"কৈ গল্প ত শেষ হল না"? আমি কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর করলুম—"এ গল্পের মজাই ত এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এদেশে কবে যে সুরু হয়েছে—তা কারও স্মরণ নেই, আর কখনও যে শেষ হবে তারও কোন আশা নেই। এ গল্প যদি কখনো শেষ হত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে বড় ট্রাজেডি হত না।——